নিষিদ্ধ লোবান

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. নবগ্রাম............3
২. জলেশ্বরী............16
৩. সিরাজ............31
৪. বিলকিস............47
৫. আলেফ মোক্তার............59
৬. মনসুর............65
৭. খোকা ভাই............77
৮. লাশ আর লাশ............87
৯. শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস............106
১০. পাটের গুদাম............118
১১. বন্দুক............119
১২. মেজর............129
১৩. হিন্দু............134

১৪. শাড়ি 150

১৫. সংকার 155

১. নবগ্রাম

নবগ্রামে ট্রেন এসে যায়। আর এক ইস্টিশান পরেই জলেশ্বরী, এ লাইনের শেষ। বিলকিস যাবে জলেশ্বরীতে। ঢাকা থেকে তোরসা জংশনে এসেছে বেলা এগারোটায়। তারপর তিনটেয় পাওয়া গেছে। জলেশ্বরীর গাড়ি। সাধারণত সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন কোনো কিছুই নিয়মিত নয়। কেউ তা আশাও করে না।

এমনিতেই তোরসা থেকে জলেশ্বরী অবধি ট্রেন চলে খুব ধীর গতিতে। ছেলেবেলায় বাবার কাছে বিলকিস। শুনেছিল, এই লাইনটি আসলে পুরনো ডিস্টিক বোর্ড সড়কের ওপর পাতা রয়েছে। তাই বাক বেশি, মাটিও পাকা নয়, ট্রেন চলে ধীর গতিতে। নইলে উল্টে পড়ে যাবে।

তবুও তোরসা থেকে জলেশ্বরী এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। নবগ্রাম আসতে আজ দুঘণ্টা কাবার হয়ে যায়।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই যাত্রীদের ভেতরে কেমন একটা ফিস-ফ্যাশ সে শুনে আসছিল অনেকক্ষণ ধরে। শহুরে এক মহিলার উপস্থিতিতে মানুষগুলো বড় একটা সপ্রতিভ ছিল না। তাছাড়া সময়টাই এমন যে, মানুষ নিচুকণ্ঠ ছাড়া কথা বলে না, অপরিচিত দূরে থাক, পরিচিতকেও বিশ্বাস করে না।

বরাবর দেখে এসেছে বিলকিস, নবগ্রামে ট্রেন দুই মিনিটের বেশি থামে না।

নির্ধারিত সেই দুমিনিট পেরিয়ে যায়। অধিকাংশ যাত্রী ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে নেমে পড়ে। ইস্টিশানের বাইরে ঘন বুনো ঝোঁপের ভেতর সরু পথ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তারা কে কোথায় মিলিয়ে যায়। আর যারা বসে থাকে, যাদের গন্তব্য জলেশ্বরী, তারা দুমিনিট পরেও যখন ট্রেন ছাড়ে না, ঢিল খাওয়া অবোধ পশুর মতো তারাও কামরা ছেড়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায়। সারা ট্রেন।

জানোলা দিয়ে একবার বাইরে তাকায় বিলকিস। কিছু বোঝা যায় না। ট্রেনের পুরনো ইনজিনটার বাষ্পীয় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

হাত ঘড়িতে বিকেল এখন পাঁচটা দশ।

বিলকিস নামে। তার সঙ্গে তার ছোট একটা সুটকেস। এ সময় কুলির ওপর নির্ভরতা কমাবার জন্যেই সে ঢাকা থেকে বহনযোগ্য সুটকেসের বেশি আনে নি। সুটকেসটা নিয়েই সে নামে।

গার্ডকে দেখা যায়। সে খুব দ্রুত পায়ে ইস্টিশান ঘরের দিকে যাচ্ছিল। বিলকিস তাকে ধরে। আমি জলেশ্বরী যাব।

গার্ড তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ। হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন জলেশ্বরীর নাম সে এই প্রথম শুনেছে অথবা উজ্জ্বল রোদের ভেতরে নবগ্রামের মতো ঘোর পল্লীর ইস্টিশানে, বিলকিসের মতো চটপটে মহিলাকে দেখে গার্ড নিশ্চিত হতে পারছে না। দৃষ্টির বিভ্রম কিনা! এ এমন একটা সময় যখন যা কিছু সম্ভব অথচ মানুষ তার মৌলিক বিস্ময়বোধ থেকেও মুক্তি পায় নি।

বিলকিস ব্যাকুল হয়ে আবার বলে, গাড়ি তো জলেশ্বরী পর্যন্ত যাবে!

আরো কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে গার্ড। লাল নীল নিশান দুটিকে সে অনাবশ্যকভাবে হাত বদল করে নেয়। তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে অথবা একটা কিছু দেয়, বোঝা যায় না, শোনা যায় না, সে ইস্টিশানে খড় ছাওয়া নিচু চালার ভেতর ঢুকে যায়। আর কাকে জিগ্যেস করবে। খুঁজে পায় না বিলকিস।

এখন সে কী করে?

ঢাকা থেকে জলেশ্বরী, কতবার যাতায়াত করেছে সেই ছেলেবেলা থেকে। কতবার সে নবগ্রামের ওপর দিয়ে এসেছে, গেছে। কিন্তু কখনো নামা হয় নি। ইস্টশানের ঝোঁপের ওপারও দেখা হয় নি।

এখানে করা থাকে? কিছুক্ষণের জন্যে অচেনা এবং অপহৃত বোধ করে সে।

তাঙ্গু চোখে পড়ে ইস্টশনের ঠিক বাইরে মাটির চাকি বুসানো কুয়োর পেছনে একটি ছেলে। সতেরো আঠারো বছর বয়স। বিলকিসের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে নেয়। মুহূর্তে সে ঝোঁপের আড়ালে কোথায় চলে যায়।

হয়তো একে কিছু জিগ্যেস করা যেত, ট্রেনের বিষয়ে কিছু জানা যেত না সত্যি, কারণ ছেলেটি দৃশ্যতই ইস্টশানের কেউ নয়, অন্তত একটি মানুষ পাওয়া যেত। সারা প্ল্যাটফরমে একটি প্রাণীও এখন নেই, বিলকিসের মনে হয় চারদিকের এই অচেনা গাছ এবং ঝোপগুলো দুর্বোধ্য কী একটা ষড়যন্ত্রে অবিরাম সরসর ফিসফিস করে চলেছে।

ইস্টিশান ঘরের ভেতর ঢোকে বিলকিস।

তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে টেবিলের ওপারের লোকটি। নিশ্চয়ই ইস্টশান মাস্টার। গার্ডকে দেখা যায় দুহাতের ভেতর মাথা রেখে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বসে থাকতে। সেও এখন তাকায়, দ্বিতীয়বার তাকে দেখা যায় বিহবল চোখে তাকাতে।

আমি জলেশ্বরী যাব। ইস্টিশান মাস্টার তার দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কোথা থেকে আসছেন?

ঢাকা থেকে।

ওদিকে গাড়ি চলেছে?

হাঁ চলছে। আমি তো এলাম।

ইস্টিশান মাস্টার দৃষ্টি ফিরিয়ে গার্ডের দিকে তাকান। ঠিক তখন ইনজিন ড্রাইভার এসে হাজির হয়।

খবর কী মাস্টার সাহেব?

আর খবর! এখন তোরসায় ফিরে যান। ট্রেন আর যাবে না।

ড্রাইভার গজগজ করে ওঠে। আগে থেকে বললে হতো। তোরসার মাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। ইনজিন ব্যাক করে চলে আসতাম, সোজা বেরিয়ে যেতাম এখন।

গার্ড রুষ্ট হয়ে ওঠে। এখন ব্যাক করে যেতে অসুবিধা কোথায়?

আবার সেই তোরসায় গিয়ে ইনজিন ঘুরিয়ে, তিন মাইল চক্কর দিয়ে যে রাখতে হবে, সে আপনি রাখবেন, কি আমি রাখব? তোরসার খবর রাখেন? যে-কোনোদিন যে-কোনো সময়ে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

এতক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে কথাগুলো বিলকিস শুনছিল। শুনে না বোঝার কিছু নেই, তবু তার মনে হচ্ছিল। আরো খানিকটা না শুনলে সে ঠিক বুঝতে পারবে না প্রসঙ্গটা। এবার সে বলে, ট্রেন এখন জলেশ্বরী যাবে না?

তিনজন নীরবে তার দিকে তাকায়।

ইস্টিশান মাস্টার উত্তর দেন, না।

কেন?

নীরবতা।

যাবে না কেন?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইস্টিশান মাস্টার গার্ডকে বলেন, আর দেরি করবেন না। অর্ডার আছে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করে দিতে। পথে সন্ধে হয়ে গেলে, বলা যায় না, কী হয়।

গার্ড চকিতে মাস্টারের দিকে তাকান। দুজনের ভেতর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। আর সে দাঁড়ায় না। নিশান দুটো তুলে নিয়ে সোজা ট্রেনের দিকে ধাবিত হয় সে। ইনজিন

ড্রাইভার হয়তো আরো কিছু বিরক্তি প্রকাশ করতে চায়। সে সঙ্গে সঙ্গে নড়ে না। ইতস্তত করতে থাকে।

যান, যান, আপনি আর ঝামেলা বাড়াবেন না।

ড্রাইভার বেরিয়ে যায়।

ইস্টিশান মাস্টারও উঠে দাঁড়ান। তিনি ড্রাইভারের পেছনে পেছনে দরোজা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে ট্রেনটিকে দেখতে থাকেন।

বিলকিস বসবে কি দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যে তার এমনও মনে হয় এই ট্রেনে ফিরে যায়। কিন্তু সে ভালো করেই জানে, ফিরে যাওয়া নয়, জলেশ্বরীতেই তাকে যেতে হবে।

হঠাৎ সে দেখতে পায় ইস্টিশান ঘরের পেছনের জানালায় একটি মুখ। সেই ছেলেটির মুখ। আবার চোখ পড়তেই মুখটি সরে যায়।

ইনজিনের দীর্ঘ হিস শোনা যায়। বঁশি বাজে না। চাকা নড়ে ওঠে। ঘরের ভেতর থেকে বগিগুলো সরে যেতে দেখা যায়। সবশেষে ইনজিন। পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে তোরসায় ফিরে যাচ্ছে। সে যে ঘরের ভেতর আছে ইস্টিশান মাস্টার হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। ট্রেন বেরিয়ে যাবার পর তিনি ঘরের ভেতরে মুখ ফিরিয়ে মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে

যান। ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কে বসে আছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ঘরটি এত নিচু, ঘরের জানোলা এত ছোট যে যথেষ্ট আলো আসে না। দুপুরবেলাতেও সন্ধ্যাভাষ ফুটে থাকে।

আপনি ঢাকা থেকে আসছেন?

হাঁ।

জলেশ্বরী যাবেন?

আমার যাওয়া দরকার। ইস্টিশান মাস্টার চিন্তিত মুখে চেয়ারে বসে পড়েন। হাত উল্টে বলেন, আমার কিছু করবার নেই। তারপর হয়তো তার মনে হয়, একজন বিপন্ন মহিলাকে এভাবে সরাসরি নিরাশ করাটা উচিত হলো না। কিন্তু আশা দেবারও আলো তার হাতে নেই। পুষিয়ে দেবার জন্যে তিনি সহানুভূতিশীল গলায় জানতে চান, জলেশ্বরীতে আপনার কেউ আছে?

আছে। মা আছে। ছোট ভাই আছে, রংপুর কলেজে পড়ে। আমার বড় বোন বিধবা, সে আছে, তার দুটো ছেলেমেয়ে আছে।

জলেশ্বরীতে কী হয়েছে? নিজের খবর দ্রুত গলায় দিয়ে যে প্রশ্নটি এতক্ষণ মনের ভেতরে কঠিন মুষ্ঠির মতো চেপে বসেছিল, বিলকিস। উচ্চারণ করে।

সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাস্টার সাহেব বলেন, কিন্তু আপনি এখন যাবেন কী করে? পাঁচ মাইলের পথ!

চোখের সমুখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। বিলকিস দেখতে পায় জলেশ্বরী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখতে পায় সে আগুন নিভে গেছে। জলেশ্বরীর বাড়িগুলো বীভৎস ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা শহরে একটিও প্রাণী নেই। বিকট জন্তুর মতো স্তব্ধতা হামা দিয়ে শহরটিকে খাবলে খাবলে খেয়ে চলেছে। ধড় ফড় করে উঠে দাঁড়ায় বিলকিস। তার ঠোঁট থেকে ভয়ার্ত প্রশ্ন গড়িয়ে পড়ে।

জলেশ্বরীতে কি যাওয়া যাবে?

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মাস্টার সাহেব উত্তর দেন–ঠিক বলতে পারছি না।

আপনি কী শুনেছেন?

খুব ভালো না।

কী ভালো না?

ভাই বোন, মায়ের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা তার কণ্ঠ ফুটে বেরোয়। একবার মনে হয়, আর কখনো তাদের মুখ দেখতে পাবে না। যেমন, সে তার স্বামী আলতাফের মুখ আর কখনো দেখতে পাবে আশা করে না।

মাস্টার সাহেব বলেন, ভালোই তো ছিল সব। এতদিন কোনো গোলমালই ছিল না।

আমিও তো চিঠি পেয়েছি মায়ের গত বুধবার।

বললাম তো, এদিকে কোনো গোলমালই ছিল না।

ইস্টিশান মাস্টার আড় চোখে একবার বিলকিসকে ভালো করে দেখে নেন। অচেনা একজনকে এত কথা বলা ঠিক হবে কি না, মীমাংসা করতে পারেন না। কোনো পুরুষ হলে হয়তো তিনি রূঢ়ভাবে বিদায় দিতেন, মহিলা বলে ইতস্তত করেন।

আবার সুশ্রী শহুরে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগটা এই আতংকশাসিত সময়ের ফাটলে অবিরাম পতনোনুখ অবস্থার ভেতরও একেবারে সংক্ষেপে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা তিনি বোধ করেন না।

এদিকে এই চার মোস সব চুপচাপ ছিল। মার্চ মাসে ঢাকার ঘটনার পর, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রংপুর থেকে মিলিটারি আসে।

তখন সবাই জলেশ্বরী থেকে চলে যায়, আমার ভাই লিখেছিল।

এখান থেকেও অনেকেই সরে গিয়েছিল। শুধু জলেশ্বরী কেন? আধিকোশা নদী পার হয়ে সব ঐ পারের গ্রামে যায়। মিলিটারি ফিরে যাওয়ার পর, বিহারীদের লুটের ভয়ে, তারপর মিলিটারি বলে যায়–যারা ঘরে ফিরবে না। তাদের ঘর জ্বলিয়ে দেওয়া হবে, সেই ভয়ে আস্তে আস্তে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে। তারপর এই কয় মাস একেবারে কিছু না। মাঝে মাঝে শোনা যায়, ইন্ডিয়া যারা গেছে, তারা যুদ্ধ করতে আসছে। কিন্তু সে রকম কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ আজ খুব ভোরবেলায়, আমি যা শুনলাম, জলেশ্বরী ডাকবাংলা, তার ঠিক আগে যে খাল আছে, আধিকোশায় গিয়ে পড়েছে, সেই খালের ওপর রেল-পুল, সেখানে ডিনামাইট ফাটে। তারপর আর কিছু শুনি নি।

অনেকে বলে মিলিটারি জলেশ্বরীতে গুলি করেছে।

মিলিটারি ছিল ওখানে?

গত মাসে তারা একটা ক্যাম্প করে। এর আগে ছিল না।

লোকজন?

কেউ কিছু বলতে পারে না।

বুকের ভেতরে শীতল বরফ অনুভব করে বিলকিস। আলতাফের কথা একবার মনে পড়ে যায়। এই কমাসের অনুপস্থিতিতে আলতাফের চেহারার চেয়ে তার অস্তিত্বটাই প্রথম উজ্জলতরভাবে মনে পড়ে।

মা ভাই বোনকেও সে আর কোনোদিন কি দেখতে পাবে না?

সুটকেস হাতে নিয়ে বিলকিস উঠে দাঁড়ায়।

ইস্টিশান মাস্টার হাত তুলে যেন বাধা দেবার চেষ্টা করেন। পরমুহূর্তেই আবার হাত ফিরিয়ে নেন তিনি।

তা হলে কী করবেন?

জলেশ্বরীতে যাব।

পাঁচ মাইল হাঁটা।

আমাকে যেতেই হবে। মাস্টার সাহেব একই সঙ্গে উদ্বেগ এবং বিস্ময় বোধ করেন। হেঁটে যেতে পারবেন?

দেখি।

একা আপনি!

একটু থমকে যায় বিলকিস। কী করব?

একটা লোকটোক না হয়, কিন্তু জলেশ্বরীতে এ অবস্থায় কেউ যেতে চায় কি না, সন্ধ্যাও হয়ে আসছে।

এই কমাসে নিজের সাহস এত বড় গেছে, বিলকিস আর অবাক হয় না।

আমি যেতে পারব।

প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রেললাইনের উত্তর যাত্রার দিকে সে ক্ষণকাল তাকায়। এখনো রোদের উজ্জ্বলতা আছে। ঘন গাছপালার ভেতরে লাইনটা হঠাৎ বাক নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। লাইনের ভেতরে দুপা দিয়ে স্থির হয়ে আছে শাদা একটি গরু। আকাশে এক চিলতে খাড়া ধূসর মেঘ। বারুদের ধোঁয়ার মতো মনে হয়।

বিলকিস রেলের পাশে সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে জলেশ্বরীর দিকে এগোয়।

২. জলেশ্বরী

তার মনে হয় কেউ যেন তার সঙ্গে চলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় সে। কান খাড়া করে রাখে। কিছু শোনা যায় না। দুএকটা পাখির ডাক, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের সরসর, ও পাশের বাঁশবনে একবার হঠাৎ ট্যাশ করে একটা শব্দ, আর কিছু না।

বাঁকটা পেরিয়ে যায় সে। পেছনের ইস্টিশান আর চোখে পড়ে না। এবার সমুখে দেখা গুমটি ঘন্ধু। আর অনেক দূর পর্যন্ত ফসলের খোলা মাঠ। রেললাইনটাও দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। হঠাৎ করে সে যেন একটা অনন্তের ভেতর গিয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে অবসন্ন বোধ করে। কিন্তু চলার গতি সে থামায় না।

অচিরে তার চোখের সমুখ থেকে সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে থাকে তার মা, ভাই, বোন, টিনের লম্বা সেই ঘর, ঘরের পেছনে টক আমগাছ। জলেশ্বরীতে অনেক দূর থেকে গাছটা চোখে পড়ে সব সময়। বিলকিস যেন সেই গাছটা লক্ষ করেই এক রোখার মতো এগোতে থাকে।

এবার সে পেছনে শব্দটা শুনতে পায় পরিষ্কার।

ঘুরে তাকিয়ে দ্যাখে, একটা ছেলে, সেই ছেলেটি কাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। বিলকিস ঘুরে তাকাতেই ছেলেটি দৌড়ের মুখে আরো কয়েক স্লিপার এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। না এগোয়, না ফিরে যায়।

মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, ছেলেটির ঐ স্থির দাঁড়িয়ে থাকা নিসর্গের অনিবার্য একটি অংশ। ছেলেটি ধীরে পায়ে আরো কয়েক স্লিপার এগিয়ে আবার থেমে যায়।

তখন মৃদু কৌতূহল অনুভব করে বিলকিস। হাত তুলে সে কাছে আসতে ইশারা করে ছেলেটিকে। নিজেও সে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

হাত দশেকের দূরত্বে স্থির হয় দুজন।

এই কী চাও?

তার ছোট ভাইয়ের চেয়েও ছোট হবে বলে বিলকিস তুমি বলতে ইতস্তত করে না। তার একটু রাগও আছে। ছেলেটি সেই ট্রেন থামবার পর থেকেই পিছু লেগেছে।

কী নাম তোমার?

ছেলেটি উত্তর দেয় না, দ্রুত চোখে বিলকিসকে আপাদমস্তক দেখতে থাকে।

তখন থেকে আমার পিছু নিয়েছ কেন?

কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে বিলকিস, ঠিক ভয় নয়, ভয়ের কাছাকাছি। অথচ করবার কিছু নেই। ছেলেটি বরং ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় বিলকিসের। কীসের ভয়?

এই এদিকে শোন।

ছেলেটি কাছে আসে। এবং এই প্রথম কথা বলে। আপনি ঢাকা থেকে আসছেন?

হাঁ!

জলেশ্বরী যাবেন?

হাঁ, তাই তো যাচ্ছি।

আপনি যাবেন না। ছেলেটির কণ্ঠস্বর হঠাৎ খুব ব্যাকুল শোনায়।

কেন?

আপনি যে একা!

ট্রেন ফিরে গেল। কী করব?

এখন না হয় না-ই গেলেন।

আমাকে যেতেই হবে।

আপনি যাবেন না।

ছেলেটি আবার নিষেধ করে। এবার তার কথার গুরুত্ব বিলকিস উপেক্ষা করতে পারে না। তার ধারণা হয়, ছেলেটি জলেশ্বরী সম্পর্কে ইস্টিশান মাস্টারের চেয়ে কিছু বেশি খবর রাখে।

তুমি মানা করছি কেন? জলেশ্বরীর অবস্থা খুব খারাপ?

খারাপ আর কত হবে। এরই ভেতরে অনেকেই তো যাতায়াত করছে।

আজ ভোরের ঘটনা কিছু জান?

এখনো ভালো করে জানি না। আপনি এভাবে যাবেন না।

সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব না?

তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো পারবেন।

ছেলেটির ভেতরে কোথায় একটা সারল্য আছে, মিনতি আছে, বিলকিসকে হঠাৎ স্পর্শ করে যায়। সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বিলকিস বলে, তাহলে আমি আর দাঁড়াই না।

সে হাঁটতে থাকে। ছেলেটিও সঙ্গ নেয়।

বিলকিসের ধারণা হয় ছেলেটি সামনে কিছু দূর গিয়েই ফিরে যাবে। কিন্তু ছেলেটিকে নিয়ে তার ভাববার সময় নেই। পুরো পাঁচ মাইল পথ তাকে ভাঙ্গতেই হবে। তার মনে পড়ে না। আর কখনো এতটা পথ সে একটানা হেঁটেছে।

ছেলেটি হঠাৎ বলে, আপনার মতো আমার একটা বোন ছিল।

থমকে দাঁড়ায় বিলকিস। সে আরো একটি দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে। ক্রিয়াপদের অতীত রূপটি একই সঙ্গে তাকে বিষণ্ণ এবং উন্মুখ করে তোলে।

ছেলেটি আর কিছু বলে না। বিলকিস তখন আবার হাঁটতে শুরু করে। ছেলেটি নীরবে তার পাশে পাশে চলে।

দুধারে জনশূন্য মাঠ। এরকমও মনে হতে পারত মানুষের বসতি এখানে নেই। কিন্তু আছে। মানুষ এমন একটা সময়ে নিজেকে গোপন রাখতেই ক্রিয়াশীল। তাই জামগাছের

তলা নির্জন, হঠাৎ যে একটা বসবার বাঁশের মাচা খাঁ খ্যা করছে। এমনকি গৃহস্থের পালিত পশুও চোখে পড়ে না। ডোবার সবুজ পানিতে ঝুঁকে পড়া বেত গাছের তীক্ষ্ণ পাতা থর থর করে। একটি কাক স্তব্ধতাকে কাঁপয়ে দিয়ে উড়ে যায়।

ছেলেটি এখনো ফিরে যায় নি দেখে বিলকিস কৃতজ্ঞ বোধ করে। মনে মনে সে আশা করে, আরো কিছুদূর তার সঙ্গে আসবে ছেলেটি। এই মুহূর্তে একটা সেতু রচনার প্রয়োজন সে অনুভব করে। বলে, ছেলেটির বোনের কথা মনে রেখে, মিলিটারি?

হাঁ তারপর, ওরা ওকে মেরে ফেলে।

তারপর? কীসের পর? কিন্তু সে প্রশ্ন চিন্তায় আসা মাত্র শিউরে ওঠে বিলকিস।

ছেলেটি বিলকিসের হাত থেকে নীরবে সুটকেসটা এবার নেয়। বলে, আপনি যাবেনই?

এতখানি এসে ঢাকায় ফিরে যাব?

তা ঠিক।

তোমার বোন কোথায় ছিল?

জলেশ্বরীতে।

বিয়ে হয়েছিল?

হবার কথা ছিল। সব ঠিক হয়ে ছিল। তারপর এই সব হয়ে গেল।

বিলকিস ঠিক বুঝতে পারে না, অবিবাহিত বোন ছিল জলেশ্বরীতে, ছেলেটি নবগ্রামে, ওদের বাড়ি কোথায়–নবগ্রামে, না জলেশ্বরীতে?

মানুষ অনেক সময় প্রশ্ন উচ্চারণের আগেই উত্তর পেয়ে যায়। ছেলেটি বলে, আমার বাবা মা ছোট ভাই, সবাই এক রাতে বিহারীদের হাতে খুন হয়। আমি ইন্ডিয়া চলে যেতাম, আমার এক বন্ধু নবগ্রামের, সে আমাকে জলেশ্বরী থেকে এখানে নিয়ে আসে। একা যেতে সাহস পাই নি।

বোঝা যায় ছেলেটি আসলে জলেশ্বরীর। বিলকিস আরো অনুভব করে, ছেলেটি তাকে বিশ্বাস করে। নইলে ইন্ডিয়া চলে যাবার কথা বলতে পারত না। তার একটু কৌতূহল হয়, ছেলেটি অচেনা একজনকে এতটা বিশ্বাস করতে পারছে কী করে?

অনেকখানি চলে এসেছে তারা, আবার রেললাইনের দুধারে জঙ্গল চেপে আসছে। দূরে সুড়ঙ্গের মতো দেখাচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে পথটুকু।

বিলকিস জিগ্যেস করে, তুমি আর কতদূর আসবে? চলুন না দেখি।

তোমার ভয় করে না?

কীসের ভয়?

জলেশ্বরীতে আজ নাকি মিলিটারি গুলি করেছে?

শুনেছি।

ওরা যদি তোমাকে ধরে?

আমি তো পথঘাট চিনি। আপনি তো তাও চেনেন না।

আমার জন্যে বিপদে পড়বে কেন?

ছেলেটি এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাকে লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত দেখায়।

তার চেয়ে তুমি ফিরে যাও।

দুজন এক সঙ্গে থাকলে ভয় নেই।

তারপর নবগ্রামে ফিরে আসবে কী করে? রাত হয়ে যাবে না?

আপনাদের বাড়িতে যদি থাকতে দেন।

তুমি চেনো আমাদের বাড়ি?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বলে, কেন চিনব না? আপনি তো কাদের মাস্টারের—

আমার বাবাকে তুমি দেখেছ?

দেখেছি, খুব ভালো মনে নেই। যেবার আমি মাইনর স্কুল থেকে হাই স্কুলে গেলাম, উনি তার আগেই মারা গেলেন তো! ওঁর কাছে যদি ইংরেজি শিখতে পারতাম!

কেন?

সকলেই বলে, কাদের মাস্টারের মতো ইংরেজি কেউ জানে না।

সবুজ সুড়ঙ্গের ভেতর এখন ঢুকে যায় ওরা। ভারি শীতল লাগে। বুনো ঝোঁপের পাতাগুলো সজল ঝকঝাক করে। পায়ে চলা সরু পথটা এখানে হারিয়ে গেছে বলে দুজনের লাইনের ওপর উঠে আসতে হয়।

তোমরা থাক কোথায়?

প্রশ্ন করেই বিলকিসের মনে পড়ে যায়, এখন তো ছেলেটির কেউই বেঁচে নেই। বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে সে অপরাধ বোধ করতে থাকে। বিষণ্ণ হয়ে যায়।

ছেলেটি ইতস্তত করে বলে, পোস্টাপিসের পেছনে জলার ঐ পারে।

বিশদ জিগ্যেস করে আর তাকে কষ্ট দিতে চায় না বিলকিস। অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে যাওয়া তরুণ এই সঙ্গীটির অদেখা বাবা, মা, বোনের কথা সে ভাবে।

পথ চলে। তার নিজের কথা মনে পড়ে যায়। আলতাফ কি বেঁচে আছে? যে খবরের কাগজে। আলতাফ কাজ করত, পচিশে মার্চ রাতে মিলিটারি সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতের শিফটে ছিল আলতাফ। সে আর ফেরে নি। যে দুটি লাশ পাওয়া গেছে, আলতাফের বলে সনাক্ত করা যায় নি। আলতাফের বন্ধু এক সাংবাদিক, অন্য কাগজের শমশের, সে কয়েকবার বলেছে–ভাবি, আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি। আলতাফ বেঁচে আছে।

তাহলে সে ফিরল না কেন? প্রতিদিন বিলকিস রাতের অন্ধকারে কানের কাছে রেডিও নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনেছে। প্রতি রাতে সে আশা করেছে। হয়তো আলতাফের গলা শোনা যাবে। কিন্তু যায় নি। শমশের আবার বলেছে, ভাবি, আলতাফ ইন্ডিয়াতে

গেছে। গেলে তো আর খবর দেওয়ার উপায় নেই, খবর আপনি পাবেনই। আজ হোক কাল হোক, আপনি দেখবেন আলতাফ বেঁচে আছে।

বিলকিস ছেলেটিকে হঠাৎ জিগ্যেস করে, কই, তোমার নাম বললে না তো।

আমার নাম? আমার নাম সিরাজ।

সিরাজ?

ছেলেটিকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখায়। কারণটা ঠাহর করতে পারে না বিলকিস। আশে পাশে কিছু টের পেয়ে গেছে সে, যা বিলকিস বুঝতে পারে নি?

দুপাশে এখনো ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর মিলিটারি ওঁৎ পেতে নেই তো?

বিলকিস ছেলেটির কাছে সরে আসে চলতে চলতে।

সিরাজ, আমরা কতদূর এসেছি?

এখনো অনেক দূর আছে।

অনেক দূর?

কতটুকু আর হেঁটেছেন?

দুমাইল হবে না?

সিরাজ হেসে ফেলে। বলে, কী যে বলেন, দিদি। পরমুহূর্তেই সিরাজ সজাগ হয়ে বিলকিসের মুখের দিকে তাকায়। ভীত গলায় বলে, পা চালিয়ে চলতে হবে। নইলে সন্ধে হয়ে যাবে।

জঙ্গল পেরিয়ে আবার ফাঁকা মাঠের ভেতর পড়ে তারা।

সিরাজ পরামর্শ দেয়, আপনি যদি স্লিপারের ওপর দিয়ে চলতে পারতেন তাহলে তাড়াতাড়ি হতো।

শাড়ি পরে স্লিপার লাফানো যায় না, বাধ্য হয়েই লাইনের পাশ দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়।

সিরাজ বলে, একটা গরুর গাড়িও যদি পাওয়া যেত। জলেশ্বরীতে ভোরে ডিনামাইট ফাটার কথা শুনে কেউ আর ওদিকে যেতে চাইল না।

কখন চেষ্টা করলে?

আপনি যখন ইস্টিশান মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

বিলকিস অবাক হয়ে যায়। ছেলেটি সেই তখন থেকে তাহলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবছে! তার বাবার যারা ছাত্র তারা এখনো নাম শুনলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সিরাজ তাঁর ছাত্র নয়, তবু সে তাঁর মেয়ের জন্যে এতটা ভাবছে, ভেবেছে। বিলকিসের গর্ব হয় বাবার জন্যে।

মায়ের মুখ চোখের সমুখে ভেসে ওঠে বিলকিসের।

হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারেন নি বাবা, মা পদে পদে গঞ্জনা দিতেন তাকে। বাবা বলতেন, আমি না হই, আমার ছাত্ররা তো হয়েছে।

জলেশ্বরীতে আজ ভোরের ঘটনার পর মা, ভাই বোন ভালো আছে তো? বিলকিস বড় বিচলিত বোধ করে।

সিরাজ, সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিলকিস স্লিপারের ওপর পা রাখে। তারপর শাড়ি একটু তুলে, হাতে গুটিয়ে নিয়ে, লম্বা পা ফেলে ডিঙোতে থাকে। প্রথমে একটু বেসামাল ঠেকে, অচিরে অভ্যোস হয়ে যায়।

আর কতদূর, সিরাজ?

আপনি হাঁপিয়ে গেছেন?

না, না।

একটু দাঁড়িয়ে যান, না হয়?

না দেরি হয়ে যাবে। মন কেমন করছে। বাড়ির কথা ভেবে কিছু ভালো লাগছে না, সিরাজ।

মাস্টার বাড়িতে কেউ কিছু করবে না।

ঢাকার কথা তুমি জান না। ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মেরেছে। হিন্দু প্রফেসরদের বেনোয়েট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

সিরাজ শিউরে ওঠে।

তুমি শোন নি?

সিরাজ ভয়ার্ত চোখে ম্লান হাসে।

আর কতদূর আছে আমাকে বল।

মাইল দুয়েক।

তুমি না হয় ফিরে যাও, সিরাজ। তোমার জন্যেই এখন আমার ভয় করছে। তুমি জান না, তোমার বয়সী ছেলেদেরই মিলিটারি ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ইনজেকশন দিয়ে সব রক্ত টেনে নেয় ওরা, হাত বাধা অনেক লাশ পাওয়া গেছে, নদীতে ভেসে আছে, তোমার বয়সী সব। তুমি ফিরে যাও, আমি ঠিক যেতে পারব।

সিরাজ দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো সে মনের ভেতর অনুরোধটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কেবল তাকে মূর্তির মতো স্থির দেখায়।

তারপর সে নীরবেই আবার চলতে শুরু করে। যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ফিরে যাবে না। তুমি অদ্ভুত ছেলে তো!

সিরাজ উত্তর দেয় না।

৩. সিরাজ

সন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ওরা জলেশ্বরীর ভেতরে পা রাখে। তিন সড়কের মোড়ে ডাকবাংলা থেকেই সীমানা ধরা হয়। কিন্তু সড়ক ধরে আসে নি। তার আগে ছিল সেই খাল, যে খালের পুলের ওপর সকালে ডিনামাইট ফেটেছিল। সে জায়গাটা ঘুরে, বনের ভেতর দিয়ে ওরা কবরস্থানের পাশ দিয়ে আবার রেললাইনের ওপর জলেশ্বরীর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমনকি দূরে যে দুএকটা ঘর চোখে পড়ে তাতেও কোনো বাতি নেই।

এতক্ষণ ফসলের মাঠে যে স্তদ্ধতা ছিল, তা থেকে শহরের এই স্তব্ধতা একেবারে আলাদা। এখানে টের পাওয়া যায় মানুষ আছে, কিন্তু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ নেই। শব্দের সম্ভাবনা আছে কিন্তু শব্দ নেই।

বিলকিস উদ্বিগ্ন চোখে সিরাজের দিকে তাকায়।

সিরাজ গুম হয়ে থাকে।

রেললাইন ধরে গেলেই বিলকিসের বাড়ি সংক্ষিপ্ত পথে পৌঁছুনো যায়। সেই পথেই এগোয় তারা। কান খাড়া করে রাখে। কিন্তু কিছুই টের পাওয়া যায় না।

দ্রুত পায়ে ওরা দুজনে চলে। আর কিছুদূর গেলেই ছোট একটা সড়ক লাইনটাকে কাটাকুটি করে গেছে। তার বাঁ হাতিতে কয়েক পা দূরেই কাদের মাস্টারের বাড়ি।

অন্ধকারের ভেতরেও দূর থেকে চোখে পড়ে লম্বা ঘরের পেছনে টক আমের গাছটি।

শেষ কয়েক হাত বিলকিস দৌড়ে যায় বাড়ির দিকে।

বাড়ির সদর দরোজায়। থমকে দাঁড়ায় সে। সিরাজ এসে যায়।

সিরাজ বলে, বাড়িতে কেউ নেই মনে হয়।

সদর দরোজায় পা দিয়েই রক্তের ভেতরে সেটা টের পেয়েছিল। দরোজা হয় খোলা। ভেতরে জমাট অন্ধকার।

ত্রস্ত পায়ে দুজনে ঢোকে। অন্তত বাইরের চেয়ে নিরাপদ। অন্ধকারের ভেতরেই চোখে পড়ে বাড়ির কিছু কাপড় ঝুলছে, বারান্দায় বালতিতে রাখা পানি, বদনা। রান্নাঘরে মেঝের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বাসনকোসন যেন এইমাত্র কেউ খেতে খেতে উঠে গেছে। দাওয়ার নির্টে পড়ে আছে শাদা-কালো খোপ কাটা ফুটবল।

শোবার ঘরের বারান্দায় কাঠের পুরনো যে চেয়ারটাতে কাদের মাস্টার বসতেন, সেই চেয়ারটা এখনো আছে। সারা বাড়িতে চেয়ারের এই শূন্যতা আরো বিকট মনে হয়।

সমস্ত ঘরগুলো দৌড়ে এসে বিলকিস চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ায়।

কোথায় গেল সব?

বুঝতে পারছি না। পাশের কোনো বাড়ি থেকেও আওয়াজ পাচ্ছি না।

কী হবে, সিরাজ?

আপনি একটু বসুন।

বিলকিস। তবু চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনি বসুন তো। এতটা পথ হেঁটে এসেছেন।

প্রায় জোর করে সে চেয়ারে বসিয়ে দেয় বিলকিসকে। যে ছেলেটিকে সারা বিকেল সদ্য কৈশোর পেরুনো অপ্রতিভা তরুণ বলে মনে হচ্ছিল, এখন তাকে অন্য রকম মনে হয়। একটি সন্ধেয় সে অনেকগুলো বৎসর পেরিয়ে এসেছে। তার গলায় নিশ্চয়তা এসেছে, চিন্তায় তৎপরতা।

আপনি বসুন। উতলা হবেন না।

সিরাজ নিজে এবার সারা বাড়ি ঘুরে আসে। প্রতিটি ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। তারপর সদর দরোজা দিয়ে বাইরে যায়। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে।

পাশের কোনো বাড়িতেও মানুষ নেই। মনে হয়, পালিয়েছে।

তার চেয়ে অন্য কিছু তো হতে পারে? মানুষগুলো খুন হতে পারে। বিলকিসের চোখে সেই উদ্বেগ ফুটে বেরোয়। সে আর বসে থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়।

তাহলে?

আপা, আপনি বসুন।

আবার তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয় সিরাজ। কিছুক্ষণ পরে কী চিন্তা করে বলে, আপনি একা থাকতে পারবেন? আধা ঘণ্টা?

তুমি কোথায় যাবে?

দেখি যদি খবর পাওয়া যায়।

তার হাত ধরে বিলকিস। না, তুমি বেরিও না।

আমার কিছু হবে না।

কোথায় খবর পাবে? কে আছে?

দেখি না, ইস্টিশানের পাশে কয়েকটা দোকান আছে, বাসা আছে, তারা হয়তো কিছু বলতে পারবে।

অত দূরে যাবে? যদি তোমাকে ধরে?

সিরাজ হাসে।

বাহাদুরি কোরো না।

আপনি জানেন না দিদি, মিলিটারি সন্ধের পর বেরোয় না। ওদের সব দিনের বেলায়।

হাত ছেড়ে দেয় বিলকিস।

আপনি একা থাকতে পারবেন তো? আমি বেশি দেরি করব না।

সিরাজ বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

আপনি বারান্দাতেই বসবেন?

কেন?

সদর দরোজায় কেউ দাঁড়ালে সোজা দেখা যায়। দরোজা বন্ধ করে যেতে চাই না। কেউ হয়তো সন্দেহ করবে। ভেতরে লোক আছে। কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তো। আপনি বরং রান্নাঘরের ওদিকটায় থাকুন, আমার গলা না পাওয়া পর্যন্ত সাড়া দেবেন না, কোনো শব্দ হলেও বেরুবেন না। আমি এসে আপনাকে ডাকব।

সিরাজ নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে যায়। তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন রোয়া ফুলিয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। রান্নাঘরের পাশে কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করে ওঠে বিলকিসের। সেখান থেকে দ্রুত পায়ে সে সরে আসে।

রান্নাঘরের পেছনের বেড়ার ওপারে পাশের বাড়ি। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার আঙিনা দেখা যায় দিনের বেলায়। মা অনেক সময় বেড়া ফাঁক করে পাশের বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। সাইকেলের দোকান আছে। ওদের; স্বামীটি হাঁপানিতে ভোগে। যখন টান ওঠে, এ বাড়িতে সারা রাত ঘুমানো যায় না তার শ্বাস নেবার আর্তিতে।

এখন সে বাড়ি নিঃস্তব্ধ। বেড়া ফাঁক করে দেখে সে। কঠিন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কান খাড়া করে। মানুষের উপস্থিতির কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

বিলকিসের মনে হয়, রান্না ঘরের দরোজায় কে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে সে ঘুরে তাকায়। কেউ না। কেউ যদি এসে দাঁড়াত তার পালাবার পথ থাকত না। লাফ দিয়ে সে ঘর থেকে বেরোয়। উঠানের কাপড়গুলো ছয়ে দেখে। শুকিয়ে খটখটি হয়ে আছে। একটা শার্ট, বাচ্চাদের কয়েকটা জামা, গামছা, দুটো শাদা শাড়ি। মৃদু বাতাসে শাড়ির ভাঁজ করা পেট ফুলে ফুলে ওঠে। আবার ঝুলে পড়ে অনবরত পতাকার মতো সখেদে কাপে। একটা শাড়ির কোণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বিলকিস তার মুখে চেপে ধরে। সাবান দিয়ে ধোবার পরও মানুষের সুবাস এখনো যায় নি। সে তার মায়ের বোনের উপস্থিতি অনুভব করে। ওদের কি মেরে ফেলেছে?

তাহলে লাশ গেল কোথায়? তাহলে তো রক্তের দাগ থাকত। অন্ধকারে হয়তো রক্তের দাগ চোখে পড়ে নি। বাতি জ্বালালেই দেখতে পাবে। জ্বালাবে সে বাতি? নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ছেলেবেলা থেকে পরিচিত পূর্বদিকের তাকে কুপি লণ্ঠন সাজানো আছে। পাশে রাখা আছে দেশলাই।

রান্নাঘরে সে আবার আসে। অতি পরিচিত ঘরে তাকে হাতড়াতে হয় না। ঠিক পৌঁছে যায় তাকের কাছে। হাত দিয়ে অনুভব করে দুটো কুপি, একটা লণ্ঠন। পাশে খড়মড় ওঠে দোলাইয়ের বাক্স।

সন্তর্পণে সে লণ্ঠন নামায়।

সিরাজ সাবধান করে গিয়েছিল, কেউ যেন টের না পায় বাড়িতে মানুষ আছে। বাতি জ্বালালে যদি কারো চোখে পড়ে? কিন্তু মিলিটারি তো রাতে বেরোয় না। চোখে পড়বে। কার? লণ্ঠনের চিমনি তুলে ধরে বিলকিস। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে কাঠিটা ধরে রেখে সে কান খাড়া করে, পেছনে তাকিয়ে দ্যাখে। তারপর সলতে ধরিয়ে খুব ছোট করে দেয়।

সেই অল্প আলোতেও চোখে পড়ে–নিভে যাওয়া উনোনের ওপর খোলা কড়াই। রান্না শেষ হবার আগেই চলে যেতে হয়েছে। ঘরের এক কোণে হয়তো চাল বাছা হচ্ছিল, কুলোর ওপর এখনো কিছু চাল। মেঝের ওপর একটা থালায় দুখানা আটার রুটি, আধা-খাওয়া কলা। লণ্ঠনটা আঁচলে ঢেকে সে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে যায় প্রথমে। কী জানি কেন, এখন আর তার তেমন ভয় করে না। এমন একেকটা মুহূর্ত আসে, মানুষ যখন বাস্তব থেকে উন্নীত হয়ে যায়।

ঘরের ভেতরে সে প্রথমেই মেঝের ওপর সন্ধান করে। কোথাও কি রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে?

খাট দেখে, দেয়াল দেখে, পাশে পার্টিশন করা তার ছোট ভাইয়ের ঘর। খোকা কি রংপুরে ছিল? না, বাড়িতেই ছিল? বিছানা ব্যবহার করা মনে হয়। হয়তো খোকা কলেজে

আর ফিরে যায় নি। জলেশ্বরীতেই বসে ছিল। খোকার জন্যে হঠাৎ বুকের ভেতরে মুহূর্তে কাঁপন ওঠে তার।

এই বয়সের ছেলেদেরই তো ওরা মেরে ফেলে।

সিরাজের কথা এতক্ষণ সে ভুলেই গিয়েছিল।

উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে সে। কতক্ষণ হয়ে গেছে, সিরাজ এখনো ফিরছে না কেন?

বাড়ির সকলে গেছে কোথায়? কখন গেছে? মেরে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে না তার সব দেখেশুনে। কিন্তু হঠাৎ এমন করে চলে যেতে হলো কেন? একবার তো নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল, আবারো কি সেখানেই গেছে?

লণ্ঠন নিভিয়ে, চেয়ারটাকে কোনো শব্দ না করে টেনে এনে বারান্দার শেষ প্রান্তে রাখে। বিলকিস। এখান থেকে সদর দরোজা চোখে পড়ে না। সে বসে।

এই প্রথম তার সারা পা টিনটিন করে ওঠে। পাঁচ মাইল হাঁটার ক্লান্তি অনুভব করে সে। ব্যথাটা আস্তে আস্তে পা থেকে সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে তার। বড় পিপাসা পায়। পেটের ভেতরে পাকিয়ে ওঠে। সারা দিন কিছু পেটে পড়ে নি। ব্যথার সঙ্গে এখন যুক্ত হয় ক্ষুধার যন্ত্রণা।

মাথার ভেতরটা ভয়াবহ রকমে শূন্য মনে হয়।

আলতাফ ফিরে আসবে সে আর আশা করে না। তবু ঢাকায় ছিল, যদি কখনো কোনো খবর পাওয়া যায়। যদি এমন হয় যে, সে ঘুমিয়ে আছে, দরোজায় সাবধানী করাঘাত, দরজা খুলতেই আলতাফ।

হাতের টাকা সব শেষ হয়ে আসে। বাড়ি ভাড়া দুমাসের বাকি পড়ে। বাড়িওয়ালাকে আজকাল আর চেনা যায় না। এখন সে দাড়ি রেখে দিয়েছে, মাথা থেকে টুপি নামে না। সে এসে ভাড়ার জন্যে যত না চাপ দেয়, তার চেয়ে বেশি করে পরামর্শ দেয়–দেশের বাড়িতে চলে যান, এখানে একা থাকা তো ভালো মনে করি না।

তারপর শমশের এসে বলে, ভাবি, ঢাকায় এখন শুরু হয়ে গেছে। শোনেন নি। পরশু দিন গুলির শব্দ? ফার্মগেটে? আমাদের ছেলেরা হামলা করেছিল।

শমশেরের সন্দেহ, মিলিটারি এখন তৎপর হয়ে যাবে, খুঁজে বের করবে, কোন বাড়ির সঙ্গে ইন্ডিয়ার যোগাযোগ আছে। আলতাফ যদি ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাকে, তাহলে মিলিটারি একদিন বিলকিসকেই ধরবে।

আমার মনে হয়, আপনি দেশের বাড়িতে চলে যান ভাবি।

আলতাফ কি ইন্ডিয়ায় গেছে? যদি এমন হয়, যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সে? এই যে শোনা যায়, ছেলেরা এখানে পুল উড়িয়ে দিয়েছে, ওখানে গ্রেনেড ছুঁড়েছে, এক গাড়ি সৈন্য খতম করেছে–যদি তার কোনো একটি আলতাফের কাজ হয়? ঢাকায় রাতে যে প্রায়ই গুলির শব্দ শোনা যায়, তার সবই কি মিলিটারির? কোনো একটি কি আলতাফের নয়?

বিলকিস একই সঙ্গে বুকের ভেতরে মঙ্গল কামনায় কাপন এবং প্রতিরোধের গৌরব অনুভব করে।

যদি গত বছরও তারা নিষেধ তুলে নিত তাহলে আজ তার কোলে থাকত সন্তান। আলতাফের।

বুকের ভেতরে হঠাৎ ক্ষোভ জমে ওঠে। বিয়ের পর তো পাঁচ বছর গেছে! এবার একটি ছেলে হবার কথা ভাবা উচিত ছিল তাদের।

ছেলে হলে, এখন এই পরিস্থিতিতে মুশকিল হতো। না হয়েছে, ভালোই হয়েছে।

কিন্তু আলতাফ যদি আর ফিরে না আসে! যদি সে রাতেই তার মৃত্যু হয়ে থাকে। আলতাফ . কি ইচ্ছে করে নীরব থাকবে? আলতাফ কি তাকে ভালোবাসে না? বিলকিস কি তাকে ভালোবাসা দেয় নি?

আপা।

চমকে ওঠে বিলকিস। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক বুঝতে পারে না, সত্যি কি মানুষের স্বর? না তার কল্পনা?

অন্ধকার ফুঁড়ে সিরাজ দেখা দেয়। আপা, আমি। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় সে। কেউ এসেছিল?

না। আমি ঠিক ছিলাম। কিছু শুনলে?

হুঁ।

কী?

খালের পুলটা ঠিক ভাঙতে পারে নি। একদিকের রেলটা গেছে।

পুলের কথা নয়, মা ভাইবোনের কথা শুনতে চায় বিলকিস। কিন্তু সাহস করে জিগ্যেস করতে পারে না। উদ্বিগ্ন চোখে অন্ধকারের ভেতর সিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা থেকে একটা ফোঁটা আলো এসে সিরাজের চোখ দুটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মনে হয়, ছলছল করছে।

সিরাজ বলে, আর যা শুনলাম, আপনার সকলেই ভালো আছে।

কার কাছে শুনলে? কোথায় আছে ওরা?

নদীর ওপারে, বিশেষ করে টাওনের এ দিকটার সবাই আজ দুপুরে বেরিয়ে যায়। আপনার সকলকেই দেখা গেছে। ওদিকের কেউ বিশেষ সরতে পারে নি। ওদিকে বিহারীদের বাড়ি অনেকগুলো। মিলিটারি ওদের বন্দুক দিয়েছে।

সিরাজ প্রায় মুখস্থের মতো না থেমে বলে যায়। এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়, যেন বক্তব্য শেষ করতে পারলেই নিষ্কৃতি পায় সে।

বিলকিস সেটা লক্ষ করে। হয়তো, একাকী বাইরে বিপদের মধ্যে ঘুরে আসবার উত্তেজনায় সিরাজের গলার স্বরও পাল্টে গেছে।

আপনি কী করছিলেন এতক্ষণ? আমার একটু দেরিই হয়ে গেল।

বসে ছিলাম।

ভয় পান নি তো?

বিলকিস ছোট্ট করে মাথা নাড়ে। ভয়ের অনুভূতিটাই তখন তার কাছে অচেনা বলে বোধ হয়।

তুমি সত্যি শুনেছি, ওরা নদীর ওপারে গেছে?

হাঁ, এখানকার কয়েকজন ছেলে, বাড়ি বাড়ি এসে মেয়েদের তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতে বলে। ওরাই সকলকে নদীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যায়।

শুধু মেয়েদের উল্লেখ শুনে বিলকিস বিচলিত হয়ে পড়ে।

আর খোকা?

আপনার ভাই?

হাঁ, খোকা সঙ্গে যায় নি?

সবাই গিয়েছে। আপনার কিছু ভাবতে হবে না। রাতে ঠিক সুবিধে হবে না। কাল দিনের বেলায় দেখি, আপনাকে ওপারে দিয়ে আসা যায় কি না।

তুমি যে বললে, রাতে মিলিটারি থাকে না, দিনে অসুবিধে হবে না?

আপনি একটা ছেড়া শাড়ি পরে নেবেন। দেখে যেন চাষীদের বাড়ির মনে হয়।

তুমি ভাই অনেক করলে আমার জন্যে। বিলকিস তার হাত ধরে বলে। সিরাজের ভেতরে কোথায় যেন সে খোকাকে দেখতে পায়। কখনো কখনো সমস্ত মানুষের মুখ এক হয়ে যায়। এখন এমনি একটা সময়।

দ্রুত কণ্ঠে সিরাজ বলে, আপনার তো কিছু খাওয়া হয় নি!

না, না, আমার খিদে পায় নি। তোমার?

দিদি, আপা, সামনে পুরো একটা রাত। না খেয়ে থাকবেন? রান্নাঘরে কিছু নেই?

দাঁড়াও বাতি জ্বালি।

না। বাতি জ্বালাবেন না।

একটু আগে লণ্ঠন ধরিয়েছিল বিলকিস। সেটা মনে করে বুক চমকে ওঠে এখন।

আসলে, আপা, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।

কেন?, এ পাড়ায় কেউ নেই। বিহারীরা জানে। লুট করতে আসতে পারে। ওদের তো এখন রাজত্ব।

তাহলে?

আসুন আগে রান্নাঘরে যাই। মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে নিয়ে চলুন বেরোই।

কোথায়?

যেখানে হোক। এখানে না, আপা। এখানে আজ রাতে ভয় আছে, আমি শুনে এসেছি।

বলতে গিয়ে সিরাজের গলাও কেঁপে যায়।

বিলকিসই তাকে সাহস দেয়; সে সাহস মুখের নয়, অন্তরের ভেতর থেকে বোধ করে সাহস।

ভয় পেও না। ঢাকায় এ কমাস একা একটা বাড়িতে থেকেছি।

কিন্তু এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে।

যাব। আগে দেখি রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা। লণ্ঠন জ্বালি। একটু আগেও জ্বেলেছিলাম।

৪. বিলকিস

রান্নাঘরে কিছুই পাওয়া যায় না। চাল আছে, কিন্তু রান্না করতে হবে।

সিরাজ তাড়া দেয়–থাক। মুড়ি বোধহয় ওরা যাবার সময় নিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ, সঙ্গে বাচ্চারা আছে।

বিধবা বোনের শিশু দুটির মুখ ক্ষণকালের জন্যে বিলকিসের চোখের ভেতরে খেলা করে। ঘরের ভেতরে একবার দেখে নেবেন নাকি?

কী দেখব?

দামি কিছু ফেলে গিয়ে থাকলে না হয়। সঙ্গে নেওয়া যেত।

কী আর সঙ্গে নেব সিরাজ? কত কিছুই তো ফেলে দিতে হলো।

ফুঁ দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দেয় সিরাজ।

তোমার কিছু খাওয়া জুটল না।

আপনিও তো না খেয়ে আপা!

নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা। পথের ওপর দাঁড়িয়ে সিরাজ একবার সামনে পেছনে দেখে নেয়। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে না।

ফিসফিস করে বলে, কেউ নেই। তবু সাবধান থাকা ভালো। পথ ছেড়ে এদিক আসুন।

বাড়িগুলোর ধার ঘেষে, ড্রেনের পাড় দিয়ে দ্রুত সন্তর্পণে হেঁটে চলে ওরা।

রেললাইন পার হয়ে কাঠের গুদামগুলো পড়ে। বড় বড় গাছ কান্ত হয়ে আছে। কিছু চেরাই হয়েছে। কাঠের সোদা গন্ধে বাতাস মম করছে। বিলকিসের মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় এখানে এসে হাঁ করে সে কাঠ চেরাই দেখত। প্রতিদিনই চোখে কাঠের গুড়ো পড়ত। চোখ লাল হয়ে যেত।

গন্তব্য ঠিক বুঝতে পারে না বিলকিস।

এর পরেই তো সিনেমা হলের রাস্তা!

হাঁ। আপনার মনে আছে?

কেন মনে থাকবে না?

ফিসফিস করে কথা বললেও সিরাজ এখন নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কথা না বলবার ইশারা দেয়।

গন্তব্য আর জিগ্যেস করা হয় না।

কখনো থেমে চারদিকে দেখে নিয়ে, কখনো দ্রুত পায়ে খোলা একটা জায়গা পার হয়ে ঝোঁপের সমান মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে সিরাজ। বিলকিস তার অনুসরণ করে।

অচিরে একটা পাড়ায় এসে ঢোকে তারা।

কথা বলবার নিষেধ সত্ত্বেও বিলকিস না বলে পারে না, মোক্তার পাড়া না?

হাঁ। প্রায় এসে গেছি।

একটা বাড়ির সমুখে এসে সিরাজ দ্রুত একবার দেখে নেয় চারদিক। তারপর হঠাৎ বিলকিসের হাত ধরে একটা চালার পেছনে টেনে নিয়ে যায়।

জলেশ্বরীতে এই প্রথম মানুষের সাড়া পায় বিলকিস।

দূরে, কাঁকর বিছানো বড় সড়কের ওপর পায়ের শব্দ। কে যেন ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে! চালার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁঠাল গাছের নিচ দিয়ে একটা বাড়ির ভেতরে ঢোকে দুজনে।

প্রশস্ত আঙ্গিনা ভেতরে। অন্ধকারও অনেকটা তরল। আঙ্গিনা জুড়ে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। বঁট দিকে তিনটি কাঁঠাল গাছ ঘিরে বেড়া চলে গেছে। ডান দিকে বড় একটা টিনের ঘর। সমুখে শেষ মাথায় রান্নার চালা। তার পাশে স্তুপ করে খড়ের গাদা, গরুর গোয়াল। গোয়ালটা শূন্য।

বাড়িটাকেও জনশূন্য মনে হয়।

কেউ নেই বাড়িতে?

ফিসফিস করে সিরাজ বলে, আছে।

বিলকিস অবাক হয়। আঙ্গিনা দেখে তার মনে হয়েছিল, কতকাল মানুষ এখানে বাস করে নি।

বিলকিস নিঃশব্দে দাঁড়াবার ইশারা করে বেড়ালের মতো লঘু পায়ে সিরাজ টিনের ঘরের বারান্দায় উঠে যায়। তখন চোখে পড়ে বিলকিসের, বারান্দায় জলচৌকির ওপর স্থির

বসে থাকা একটা মানুষের আদল। তার সঙ্গে কথা হয় সিরাজের। তারপর সে বারান্দার কিনারে এসে ইশারায় বিলকিসকে কাছে ডাকে।

কাছে আসতেই সিরাজ লোকটিকে বলে, কাদের মাস্টারের মেয়ে।

লোকটি প্রাণহীন মূর্তির মতো সমুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কথাটা শুনেছে কি শোনে নি, বিন্দুমাত্র বোঝা যায় না। লোকটির দৃষ্টি আঙ্গিনার দিকে স্থির নিবদ্ধ।

সিরাজ চাপা গলায় বলে, ইনি আলেফ মোক্তার। এখন চোখে দেখতে পান না।

অস্ফুট কাতর ধ্বনি করে ওঠে বিলকিস। এককালের জাঁদরেল মোক্তার বলে খ্যাতি ছিল তার। বৃটিশ আমলে মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা ছিলেন। বিলকিসের এখনো মনে আছে, ভোটে জেতার পর, তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে জলেশ্বরীতে মিছিল বেরিয়েছিল। পাকিস্তান হবার বছরের বালিকা বিদ্যালয় ঈদ পুনর্মিলনীতে আবৃত্তি করে বিলকিস ফার্স্ট হয়েছিল। পুরস্কার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আলেফ মোক্তার। তারপর, চুয়ান্ন সালের ভোটে যখন নবগ্রামের কাশেম মিয়ার কাছে তিনি হেরে যান তখন, বিলকিসের মনে পড়ে, মা গঞ্জনা দিচ্ছিলেন বাবাকে-কই ছাত্রের জন্যে তোমার না। এত গর্ব! তোমার ছাত্রই তো এখন জিতেছে। মনখারাপ করছ কেন? এতকালের বন্ধুর জন্যে মন খারাপ না করে কাশেমের জন্যে লাফাও! দেখি ছাত্রের দিকে তোমার কত টান?

বাবার সেই অপ্রস্তুত মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পায় বিলকিস।

এই সেই আলেফ মোক্তার!

পাতা ঝরা আঙ্গিনার দিকে তিনি স্থির তাকিয়ে থাকেন কিংবা চোখ হারিয়ে ফেলবার পরও তাকিয়ে থাকার অভ্যাস মানুষের যায় না।

ঠিক কী বলবে বুঝতে পারে না বিলকিস।

উনি ঐ রকমই বসে থাকেন। সারা দিন-রাত।

ঘরের ভেতরে সেকালের ভারি দুটো আলমারি, অতি প্রশস্ত একটি খাট, অন্ধকারেও বার্নিশের কোথাও কোথাও আলোর বিন্দু ধরা পড়ে আছে। আর একটা ভ্যাপসা গন্ধ, কাপড় ভিজে ভালো করে না শুকোবার মতো তীব্র ঘ্রাণ।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

না!

বৌ, ছেলে, মেয়ে?

এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল নেভির এক লোকের সঙ্গে, কোথায় আছে জানি না। বাকি দুই ছেলে, দুজনেই পাবনায়। একটু থেমে সিরাজ যোগ করে, মানসিক হাসপাতালে। একটু দাঁড়ান তো আপা।

সিরাজ বাইরে যায়। অনুচ্চ স্বরে আলেফ মোক্তারের সঙ্গে কী কথা বলে। আবার ফিরে আসে ঘরে।

বিলকিস জিগ্যেস করে, বৌ?

বলতে পারব না কেন, বৌ তার বাপের বাড়িতেই অনেকদিন থেকে আছে। চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল প্রায় সেই থেকেই।

আসে না?

কী জানি! অনেকদিন দেখি নি।

উনি এভাবে থাকেন, দেখে কে? রান্না খাওয়া?

ওর পুরনো মুহুরি, সে-ই দেখাশোনা করত। গণ্ডগোলের সময় সে পালিয়েছে।

এখন?

সিরাজ চুপ করে থাকে।

এখন কে দেখে?

আপা, এখন কে কাকে দেখবে?

সিরাজের এই নিষ্ঠুর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় বিলকিস! একটা মানুষ, অন্ধ, বয়স প্রায় সত্তর, তাকে কেউ দেখছে কিনা, সে প্রশ্নে এতটা তাচ্ছিল্য আশা করা যায় না। অন্তত সিরাজের কাছ থেকে, যে বিলকিসকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে নবগ্রাম থেকে এ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে এবং কেবল এই আশংকায় যে বিলকিসের কোনো ক্ষতি বা বিপদ হতে পারে।

পা আবার টন টন করে ওঠে। বিলকিস অনুমানে খাটের কোণ হাতড়ে বসে পড়ে।

সিরাজ, অন্ধ বুড়ো মানুষ, কেউ তাকে দেখছে না, বলতে গিয়ে হাসলে কেন?

সিরাজ আবার হাসে। খুব সংক্ষিপ্ত মৃদু। তরঙ্গের হাসি। কাছে আসে সে।

আপা, আমি হাসছি না। এটা হাসি নয়, আপা। শুনবেন আলেফ মোক্তারের অবস্থা? কে তাকে দেখে? বিহারী কতগুলো ছোঁকরা আছে, তারা।

বিহারী?

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বিলকিস। এ কোথায় নিয়ে এলে তাকে সিরাজ?

হাঁ, বিহারী কয়েকটা ছোঁকরা। প্রথমবার জলশ্বেরীতে যখন মিলিটারি আসে, তার আগের রাতে টের পাওয়া গিয়েছিল, ওরা আসবে। ছেলেরা সবাইকে সাবধান করে দেয়। মাঝরাতে সবাই শহর ছেড়ে নদীর ওপারে চলে যায়। বাঙালিদের ভেতরে পড়ে থাকে। শুধু আলেফ মোক্তার। মিলিটারি আসবার পর বিহারীরা দলেবলে বেরোয়, প্রতিটা বাড়ি ঢুকে তছনছ করে, লুট করে। একদল এসে দেখা পায় মোক্তার সাহেবের। তারপর অন্ধ দেখে বদমাশগুলোর ফুর্তি হয়। আলেক মোক্তারের গলায় জুতোর মালা দিয়ে, বুকের ওপর জয় বাংলার নিশান লাগিয়ে কোমরে গরু বাঁধার দড়ি বেঁধে সারা শহর তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্ধ মানুষ, হাঁটতে পারে না, বার বার পড়ে যায়, বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে খাড়া করে, লাথি মারে, টেনে নিয়ে বেড়ায়। তারপর ফিরিয়ে এনে একা বাড়িতে রেখে যায়। আবার পরের দিন তাকে নিয়ে বেরোয়, আবার সেই এক বৃত্তান্ত। এরপর মাঝে মাঝেই তাকে নিয়ে এরকম করে। মজা করবাব জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারাই কখনো কিছু এনে খেতে দেয়।

হতভম্ভ হয়ে যায় বিলকিস।

শুনলাম, আজো নিয়ে সারা বিকেল ঐভাবে ঘুরিয়েছে। তারপর থেকে চুপ করে জলচৌকির ওপর বসে আছেন। সিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে, এখানে যা লুট করবার সব নিয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে কেউ আসে না। আর। তাই এখানে আপনাকে নিয়ে এলাম। এখানে ওরা আজ রাতে আর আসবে না। আর এলেও ভেতরে ঢুকবে না। জানেন তো, পালাবার সবচে ভালো জায়গা শত্রুর ঘাটির ভেতরে।

বয়সের তুলনায় সিরাজ তার কথায় যে অভিজ্ঞতার পরিচয় অবলীলাক্রমে দেয়, বিলকিস অবাক না হয়ে পারে না। তার ভাই খোকাও কি এ রকম সাবালক হয়ে গেছে?

বিলকিস আস্তে আস্তে বাইরে আসে। এসে, আলেফ মোক্তারের কাছে দাঁড়ায়।

কে? আঙ্গিনার দিকে চোখ রেখেই চমকে প্রশ্নটা করেন আলেফ মোক্তার।

আমি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু আর বলেন না। সিরাজ নিঃশব্দে এসে বিলকিসের পাশে দাঁড়ায়।

হঠাৎ গলা পরিষ্কার করেন আলেফ মোক্তার। সেই অপ্রত্যাশিত শব্দে সমস্ত পরিবেশ যেন চমকে ওঠে। তারপর তিনি, আঙ্গিনার দিকে স্থির চোখ রেখেই, অত্যন্ত. দৃঢ় গলায় বলেন, তোমার বাবা আমার খুব বন্ধু লোক ছিলেন।

তারপর তিনি চুপ করে যান। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বিলকিস, কিন্তু মোক্তার আর কিছু বলেন না!

আপনি ভেতরে যাবেন না?

সাড়া নেই।

ভেতরে আপনাকে শুইয়ে দিই?

তবু কোনো সাড়া নেই।

সিরাজ অসহিষ্ণু গলায় বলে, উনি এখানেই থাকুন না? আপনি ভেতরে যান। আমি ওর কাছে বসছি।

এখানে কতক্ষণ বসে থাকবেন?

বিলকিস সিরাজকে উপেক্ষা করেই মোক্তার সাহেবকে আবারো সম্বোধন করে।

আলেফ মোক্তার হঠাৎ হাহাকার করে ওঠেন, কোথায় যাব? কবরে যাব? আজ এতগুলো ছেলে মেরে ফেলল।

কী? কী বললেন? আর্তনাদ করে ওঠে বিলকিস।

দেখতে পাই না, তবু ওদের মুখ দেখতে পাই।

ফুঁপিয়ে ওঠেন আলেফ মোক্তার। সিরাজ অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড করে বসে। বিলকিসের হাত ধরে, টান মেরে সরিয়ে এনে, ঘরের ভেতর ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। চাপা গলায় গর্জন করে ওঠে, আপনি ভেতরে থাকুন।

না।

পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে বারান্দায় ছুটে আসে বিলকিস।

কাদের মেরেছে? কোন ছেলেদের?

বিলকিসের বুকের ভেতর ঠাস করে এসে আছাড় খায় খোকার মুখ।

আলেফ মোক্তার এই প্রথমবার আঙ্গিনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাতড়ে খপ করে বিলকিসের হাতখানা ধরে ফেলেন।

দুর্বল কম্পিত হাতে দ্রুত গতিতে সারা হাত ছুঁয়ে দেখেন। তারপর বলেন, সব লাইন করে। বাজারে। তোমার ভাইয়ের নাম খোকা না?

৫. আলেফ মোক্তার

আপনি এদিকে আসুন।

সিরাজের কণ্ঠস্বর। থমথমে। বিলকিস বিস্ফারিত চোখে একবার সিরাজ, একবার আলেফ মোক্তারের দিকে তাকায়। তারপর, সিরাজকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে ঢোকে।

আপনি বসুন।

নিজেই অবাক হয়ে যায়, বিলকিস অত্যন্ত শান্তভাবে খাটের কোণে গিয়ে বসে। সিরাজ একটুক্ষণ সমুখে দাঁড়িয়ে থেকে পাশে বসে তার। আলমারির নকশায় একটা উজ্জ্বল ছোট্ট আলোর বিন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলে, আপনার ভাই খোকা মারা গেছে। এতক্ষণ আপনাকে বলি নি। ভেবেছিলাম, বলব না।

কথাটা বলেই সিরাজ একহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

বিলকিসের কান্না পায় না। তার মনে হয়, একটা জানা খবরই দ্বিতীয়বার কেউ তাকে শুনিয়ে গেল।

সিরাজের পিঠে হাত রাখে সে।

তখন আরো ফুঁপিয়ে ওঠে সিরাজ। এই ক মাসের প্রতিটি মৃত্যু একের পর এক তরঙ্গের মতো তার দিকে ধেয়ে আসে।

শান্ত কণ্ঠে বিলকিস। উচ্চারণ করে, খোকা নেই?

নিজেকে সামলে নেয় সিরাজ। সামলাতে একটু সময় লাগে। সেটুকু অপেক্ষা করে বিলকিস।

তারপর জিগ্যেস করে, কী হয়েছিল?

অনেকগুলো ছেলে। বাজারে দাঁড় করায়। এক সঙ্গে গুলি করেছিল।

খোকা ছিল?

হাঁ।

তুমি কখন জানলে?

তখন খোঁজ নিতে বেরুলাম। মোক্তার সাহেবের কাছে শুনলাম।

খোকার নাম করে বললেন?

না, বললেন, অনেকে ছিল, মফিজ, নান্টু, এরফান, চুনি মার্চেন্টের ছোট শালা, তারপর বললেন কাদের মাস্টারের ছেলে। বাজার করতে এসেছিল কিছু লোক, মারা গেছে, কয়েকজন দোকানদার, কয়েকটা বাচ্চা ছেলেও আছে।

দুপুরবেলায়?

কখন ঠিক জানি না।

কিছুক্ষণ শূন্যতার ভেতরে নিক্ষিপ্ত থেকে বিলকিস জিগ্যেস করে, উনি দেখতে পান না। কেউ তাকে বলেছে গুলির কথা। কে বলেছে?

প্রশ্ন করে সিরাজের কাছে উত্তর আশা না করে সে উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় যাচ্ছেন?

ওর কাছে শুনতে চাই।

আর কী শুনবেন? বিহারীরা বিকেলবেলায় ওকে কোমরে দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাজারে। সেখানে ওরাই ওকে বলে ছেলেদের নাম।

ঠিক তখন দরোজার কাছে এসে দাঁড়ান আলেফ মোক্তার। হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে এগিয়ে আসেন। তিনি। বিলকিস উঠে তার হাত ধরে। বিছানায় নিয়ে আসে।

আলেফ মোক্তার কাতর একটা আহি ধ্বনি করে নীরব হয়ে যান। তাকে কিছু জিগ্যেস করবার মতো নিষ্ঠুর হতে পারে না বিলকিস।

অনেকক্ষণ পরে আলেফ মোক্তার বলেন, এত বড় পাষাণ, মানুষের অন্তঃকরণ নেই, হুকুম দিয়েছে, লাশ যেখানে আছে সেখানে থাকবে। কেউ হাত দিতে পারবে না। কচি ছেলেগুলোকে কাক শকুনে ছিঁড়ে খাবে, দাফন হবে না।

কে হুকুম দিয়েছে?

মিলিটারি। মিলিটারি ছাড়া হুকুম দেবার আছে কে?

তাদের মরতে হবে না কোনোদিন? তাদের মাটি দেবার দরকার হবে না কোনোদিন? ছেলেদের প্রাণ নিয়েছিস, মায়ের কোল খালি করেছিস, মায়ের মতো মাটি, তার কোলে রাখতে দিবি না। এজিদের দল? যেখানকার লাশ সেখানে থাকবে? মাটি সর্বত্র, মুখের দল। মাটি তাদের নিজের বুকে টেনে নেবে। আল্লাহর ফেরেশতা দাফন করবে। ফেরেশতার কাছে তোর হুকুম টিকবে না।

খসখসে গলায় বিলাপ করে চলেন আলেফ মোক্তার।

তার সে বিলাপ সহ্য করা যায় না। কিন্তু চুপ করতে বলবে, মনে হয় বাতাস হাহাকার করছে, অন্ধকার বিলাপ করে চলেছে। মানুষের সাধ্য নেই তা থামিয়ে দেয়।

এক সময়ে নিজেই তিনি চুপ করে যান। কেবল শোঁ শোঁ করে কষ্টকর শ্বাস নেবার শব্দ ওঠে।

সিরাজ।

আপা।

বারান্দায় এসো।

বাইরে এসে জিজ্ঞাসু চোখে সিরাজ বিলকিসের দিকে তাকায়। সিরাজ, তুমি বলছিলে না, মিলিটারি রাতে বেরোয় না?

কেন?

আমি যাব। বাজারে যাব। খোকার লাশ না দেখলে বিশ্বাস হবে না, খোকাকে আমি দেখব। তাকে আমি নিজের হাতে মাটি দেব।

কুথাটা শুনে চঞ্চল হয়ে পড়ে সিরাজ।

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

৬. মনসুর

বিলকিসের গলায় নিষ্কম্প ঋজু উচ্চারণ শুনে সিরাজ ভীত হয়ে পড়ে।

যাবে কি যাবে না?

এ একেবারে অসম্ভব কথা আপা।

তুমি না যাও, আমি একাই যাব।

সিরাজ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার কথা নয়। আমার জন্যে বলছি না। যাওয়াই সম্ভব হবে না। খোলা জায়গা। বিহারীদের চোখে পড়ে যাবেন।

তাই বলে, আমার মায়ের পেটের ভাই, তার দাফন হবে না, আমি চুপ করে থাকব?

আপনি শুধু শুধু পাগলামি করছেন।

আমি যাব, সিরাজ।

ওরা দেখামাত্র গুলি করে। করুক।

আমার লাশও পড়ে থাকবে।

এতক্ষণ যে বিলকিসকে সিরাজ জানত, এখন অন্য কেউ মনে হয়। এমন কেউ যে একটা প্রবল ঝড়ের ভেতর স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

সিরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে। সন্ধের সময় বিলকিসকে রেখে যখন খবর নিতে বেরিয়েছিল, তখন কেবল আলেফ মোক্তার নয়, মিষ্টি দোকমানের মকবুলদার কাছেও শুনেছিল, লাশ যেখানে আছে সেখানে পড়ে থাকবে, কেউ ছোঁয়া দূরে থাক, কাছে গেলে পর্যন্ত গুলি করা হবে। কৌশলটা আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্যে, না লাশের নিকটজন কারা আসে তাদের ধরবার জন্য, স্পষ্ট নয়।

তোমার যদি ভয় করে, সিরাজ তুমি না হয় থাক, আমি একাই যাব। ঢাকা থেকে ভাইয়ের মরবার খবর শোনার জন্য যদি এসে থাকি তো তার মরা মুখও আমি দেখে যাব, নিজের হাতে মাটি দেব।

বেশ দেবেন। আপনার ভয় না করলে আমার কী? কথাটা বেপরোয়া শোনাতে পারত। শোনাল কিন্তু অভিমানকম্পিত।

বিলকিস তার হাত ধরে জলচৌকির ওপর বসায়। তারপর বলে, মোক্তার সাহেব কী করছেন, দেখা দরকার।

উঠে ভেতরে যায় সে।

কাটা একটা গাছের মতো পড়ে আছেন তিনি। মুখের ওপর ঝাঁকে দেখে, ঘুমিয়ে গেছেন। মরে যান নি তো? বুকের পরে আলতো করে হাত রাখে বিলকিস। খুব ধীরে শ্বাস বইছে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বিক্ষোভ অত্যন্ত নিচু পর্দায় চলছে। তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে। বাবার কথা মুহূর্তের জন্যে মনের ভেতরে নড়ে ওঠে। আবার শান্ত হয়ে যায়।

বিলকিস বাইরে এসে সিরাজের পাশে বসে।

কখন বেরুলে ভালো?

আরো কিছু পরে। দুপুররাতের দিকে।

তখন ওরা টহল দেয় না? রাতদুপুরের পরে বড় একটা না। বিহারী হোক, আর মিলিটারির যত চেলাই হোক, ওদেরও তো ভয় আছে।

কীসের ভয়?

বারে, দেখছেন না চোখের সামনে পুলে ডিনামাইট মেরে গেল? রাতেই ওরা আসে। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকে। ছায়ার মতো চলাফেরা করে। হামলা করে কোথায় মিশে যায়। কেউ বলতে পারে না।

খোদ ঢাকাতেই তার প্রমাণ পেয়েছে বিলকিস। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে খবরে শুনেছে।

সিরাজ বলে, সেই রাগেই তো আজ এতগুলো খুন করল। এর প্রতিশোধ দেখবেন ওরা নেবে।

ছেলেটির ভয় অনেকটা কমে গেছে। তার কথা শুনলে মনে হয়, পারলে সে এক্ষুণি প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিলকিস বলে, আচ্ছা সিরাজ, একটা কথার উত্তর দেবে? এত ঝুঁকি নিয়ে আমার সঙ্গে জুটে গেলে কেন? আমি সত্যি চাই না, আমার জন্যে তোমার কোনো বিপদ হোক। অনেক করেছ তুমি।

বিলকিস সমোহে তার হাতে কয়েকবার চাপড় দেয়। আসলে সে বুঝে দেখতে চায়, কাঁচা বয়সে মেয়েদের জন্য মোহ থেকেই সিরাজ এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছে কিনা। তা যদি হয় তার উচিত হবে না। তাকে প্রশ্রয় দেয়া।

বল। সেই নবগ্রাম থেকে এতদূর এলে, এত ঝুঁকি নিলে কেন? খোকার মতো তুমিও যদি ধরা পড়তে? তোমাকেও যদি মেরে ফেলত?

সিরাজ চুপ করে ভাবে। ক্রমশ মাথাটা তার বন্ধুকে আসে সমুখের দিকে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ মাথা তুলে বলে, হাঁ, ধরা পড়তে পারতাম।

তবু এলে কেন?

আমি যে কাজ করছি।

তার মানে?

কাজ করছি।

সিরাজ অপ্রস্তুতভাবে একটুখানি হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, বাবা-মা-বোন সবাই চলে যাবার পর, আপনাকে বলেছি তো, ইন্ডিয়ায় চলে যেতে চেয়েছিলাম। সাহস হয় নি। কয়েক সপ্তাহ পালিয়ে বেড়িয়েছি। একদিন কী একটা সোর উঠল, রাতদুপুরে উঠে পালাতে হলো। জানেন দিদি, এমন জায়গা দিয়ে ঘোর অন্ধকারের ভেতরে আমাকে পালাতে হয়েছিল, যেখানে গোক্ষুর সাপের আস্তানা! সবাই জানে। দিনের বেলাতেই আমরা কেউ ওদিকের ধারে কাছে যেতাম না। সেখান দিয়েই আমাকে পালাতে হয়, আপা।

সিরাজের মুখে একবার আপা একবার দিদি এই প্রথম কানে লাগে বিলকিসের। জলেশ্বরী হিন্দুপ্রধান জায়গা ছিল এক সময়। এখনো এখানে অনেক মুসলমান পরিবার দাদা-দিদি ব্যবহার করে। আপা চল হয়েছে পাকিস্তান হবার পর। তার আগে বুবু চলত। বুবু ডাক আশা করে নি বিলকিস, কিন্তু আপা আর দিদি এর কোনো একটা হলে তার কানে লাগত। না। সম্বোধনের দুটোই ব্যবহার করাতে সিরাজকে তার বয়সের চেয়েও ছোট মনে হয়, বেড়ে ওঠা একটা কিশোর মনে হয়, যে এখনো ঠিক অভ্যস্ত নয় অচেনা কোনো মহিলার সঙ্গে দীর্ঘকাল কথা বলতে।

সিরাজ বলে চলে, প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, এই সাপের কামড়ে মরব, এই সাপ ছোবল দেবে। জানেন তো রংপুর গোক্ষুর সাপের জন্যে কেমন বিখ্যাত? কিন্তু কী আশ্চর্য কী করে বেঁচে গেলাম! পরদিন মনে হলো, কেন যাব। ইন্ডিয়ায়? যাব না। এখানেই থাকব। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন যেখানে গেছে, সেখানেই থাকিব, শেষ দেখব।

তুমি খুব সাহসী।

না, সাহস নয়, আপা। সাহস ওদের, আমার কয়েকজন বন্ধু ওরা গোড়াতেই ইন্ডিয়া গেছে। কুসুকুম দিয়েছে, দেশের ভেতরে ঢুকে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করছে সাহস ওদের। ওরা সাহসী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিরাজ যেন বন্ধুদের কল্পনায় দেখে নেয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে তার। কী হলো?

কিছু না।

তুমি সাহসী। নইলে ডিনামাইটের ঘটনা শুনেও তুমি আমার সঙ্গে জলেশ্বরী চলে আসতে পারলে?

মনসুরদা বলেছেন বলেই তো এলাম।

মনসুরদা?

আপনাকে বলা হয় নি। এই কথাটাই আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। খেই হারিয়ে ফেললাম। মনসুরদার সঙ্গে কাজ করছি। ওপার থেকে যারা আসে তাদের সাহায্য করি। মনসুরদা করেন। আজ ডিনামাইট হয়ে যাবার পর এক ট্রেন সৈন্য আসে। তারপর আমার ওপর ডিউটি পড়েছিল, ইস্টিশানের দিকে চোখ রাখার। বিকেলের ট্রেনে আপনি এলেন।

আমি লক্ষ করেছিলাম, তুমি আমাকে প্লাটফরমে দেখেই ঝোঁপের আড়ালে চলে গেলে।

আপনি তো আর দশজন যাত্রীর মতো নন। আপনাকে দেখেই চেনা যায় ঢাকা এসেছেন।

তাই?

হাঁ। আমি তো এক নজরেই বুঝেছি। মনসুরদাকে বলতেই তিনি ভালো করে দেখলেন। আপুনি তুখন ইন্টিশনের ঘরের ভেতরে। জানালা দিয়ে দেখেই মনসুরদা আমাকে বললেন, কে চিনেছিস? কাদের মাস্টার, আমার স্যারের মেয়ে।

তোমার মনসুরদা আমার বাবার ছাত্র? কে বল তো?

আপনি কি চিনবেন? পরাণ হকারের নাতি। বৃটিশ আমলে ইংরেজ সাহেবের কাছ থেকে যে মেডেল পেয়েছিল। সে মেডেল আমি দেখেছি। এখনো ওদের ঘরে আছে। মনসুরদা। আমাকে বললেন, বোধহয় জলেশ্বরীতে যেতে চায়, কিছুতেই যেতে দিবি না। আর যদি যেতেই চায়, পৌঁছে দিয়ে আসবি।

তোমার মনসুরদা এল না কেন সামনে?

তার অনেক কাজ। তাছাড়া ভোরবেলার ঐ হামলাটার পরে মনসুরদা তো কিছুতেই জলেশ্বরীতে যেতে পারেন না। আপনি যদি জলেশ্বরীতে যেতে চাইতেন? কী করতেন

তিনি? তাই আমাকে পাঠালেন। আমি তো আপনাকে অনেকবার নিষেধ করলাম। আপনি শুনলেন না।

তোমার মনসুরদা তো বলেই ছিল, আমি যদি যেতে চাই, আমাকে পৌঁছে দেবে।

তাই তো দিলাম।

উনি তো বলেন নি, আমার সঙ্গে বাজারে যাবে খোকার লাশ দাফন করতে।

সিরাজ চিন্তা করে।

ধর, উনি মানা করলেন, তাও তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

সিরাজকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়। অবশেষে বলে, আমার মনে হয়, মনসুরদাও আপনার সঙ্গে যেতেন।

কেন বলছ?

আপনি যে একটা কথা বললেন তা আমার মনে গেঁথে গেছে।

কোন কথা?

ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে শুনেও থাকতে পারেন না।

সিরাজের কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষণ্নতা এবং খেদ ফুটে বেরোয়।

জানেন আপা, আমার মনে হয়, আমি খুব নিচু ধরনের ভীতু।

আবার ও কথা কেন?

বিহারীরা যখন এল, আমি বাবা-মাকে ফেলে পালিয়ে গেলাম কেন? আমি তো জানতাম ওরা কিছুতেই প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে না। কাউকে। সবাইকে ফেলে আমি একা পালিয়ে গেলাম, ভীতু নাই তো কী? আপনার মতো আমার সাহস নেই কেন? ভাইয়ের জন্যে আপনার যে রকম টান, আমার ছিল না কেন?

সিরাজ মুখ ঢাকে।

কাঁদছ? বিলকিস তার পিঠে হাত রাখে। বলে, সিরাজ, মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখেও কেউ যদি আমাকে বলত, বেশি কিছু না, মাঝরাতে নির্জন একটা রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যেতে পারবে? বিশ্বাস কর, আমি কল্পনা করেও ভয়ে মরে যেতাম। পঁচিশ তারিখে এত লোক মারা গেছে শুনেছি, আলতাফ যদি বেঁচে থাকত, মৃত্যুকে আমার ভয় করত। এতগুলো লোকের মৃত্যু আমার কাছে কাহিনী হয়ে থাকত। আলতাফ নেই, আমার মৃত্য-

ভয় নেই, মৃত্যুর জন্য আমার শোকও নেই। খোকাকে গুলি করে মেরেছে, খোকার লাশ গড়ে আছে খোকার লাশ কেউ ছুঁতে পারবে না, কই, আমার চোখে তো পানি আসছে না, পানি এল না। ছ মাস আগেও কেউ যদি খোকার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে দিত, পৃথিবীটা চৌচির হয়ে যেত না? এখন তো আমি ঠিক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। খোকাকে কবর দেওয়ার কথা ভাবছি। কেউ ভীত নয় সিরাজ। কেউ ভেঙ্গে পড়ে না, শোক কখনও এত বড় নয় যে, মানুষ মাস্থা তুলে দাঁড়াতে পারে না। একটু চুপ থেকে বিলকিস যোগ করে, কখন বেরুব?

সচকিত হয়ে ওঠে সিরাজ। এতক্ষণ সে যেন অন্য একটা জগতে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বেরুবার আগে আমি বরং একবার ঘুরে দেখে আসি।

কদ্দূর যাচ্ছ?

বেশি দূর না। মোড় পর্যন্ত। তখন পায়ের আওয়াজ পেলেন না? শান্তি কমিটির ছোকরাগুলো টহল দিচ্ছিল। ওরা যতক্ষণ আছে, মোড় পেরুনো মুশকিল। তবে, বেশিক্ষণ থাকে না, এই যা। আমি দেখে আসি।

আবার বেড়ালের মতো আঙ্গিনাটি মুহূর্তে পার হয়ে সিরাজ বেড়ার আড়ালে হারিয়ে যায়।

একবার ধক করে ওঠে বিলকিসের বুক। একবার খোকার মুখ মনে পড়ে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, নিজের জমাট বাধা রক্তের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খোকা।

বিলকিসের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে।

৭. খোকা ভাই

কলেরায় উজাড় কোনো গ্রামের মতো পড়ে আছে জলেশ্বরী। কুকুরগুলো পর্যন্ত পথে নেই। অন্ধকারে নিঃশব্দে সন্তর্পণে মোড়ের কাছে এসে দাঁড়ায় বিলকিস আর সিরাজ। কাপ বন্ধ একটা পানের দোকানের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বড় সড়কের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

এখন চাঁদ উঠে গেছে। পেট উঁচু তার ঘোলাটে আলোয় সড়কটিকে অস্বাভাবিক স্থির এবং অন্য কোনো জনপদের বলে মনে হয়।

দূরে একটা শব্দ পাওয়া যায়।

ওরা এখনো আছে।

ফিসফিস করে ওঠে সিরাজ।

শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু শব্দের উৎস দেখা যায় না। ফলে সতর্ক থাকতে হয় আরো বেশি করে। কখন কোথা থেকে উদিত হয়, কে জানে!

পায়ের শব্দ মসিমস করে। নিস্তব্ধ রাতের ভেতরে সামান্য শব্দও তীব্র আকার ধারণ করে। দিকভ্রম হয়ে শ্রোতার। বিলকিস আর সিরাজ অনবরত ডাইনে-বায়ে দেখে। এমনকি পেছনেও, যেখানে খাড়া দেয়াল উঠে গেছে পরিত্যক্ত কালী মন্দিরের।

মনে হচ্ছে, ভালো করেই টহল দিচ্ছে।

দেখতে পেলেও হতো।

দেখতে পেলে টুক করে পেরিয়ে যাওয়া যেত বড় সড়ক। এখন ঝুঁকি অনেক। যদি দেখে ফেলে, বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা পেরিয়ে যাবে সত্যি, কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বেজায়গায় আটকে পড়তে হবে। তারচে অপেক্ষা করাই ভালো।

সিরাজ?

কী?

শব্দের দিকে কান রেখে ফিসফিস করে বিলকিস বলে, এখনো তুমি ফিরে যেতে পার। সিরাজ কিছু বলে না।

খোকা সত্যি নেই?

মকবুলদাও বললেন।

তুমি তো দেখে এলে, তখন লোক ছিল না।

তখন মনে হলো, কেউ নেই। এখন আবার শব্দ শুনছি।

মোক্তার সাহেব আর কী বললেন?

কীসের কথা?

খোকা।

আপনাকে বলা যাবে না।

যাবে। আমার কিছু হবে না।

সিরাজ চিন্তা করে খানিকক্ষণ। মটাস করে একটা শব্দ হয়।

ও কী?

কলা গাছের পচা পাতা খসে পড়ল।

কালী মন্দিরের ওপাশে কলা গাছের মাথাগুলো বাতাসে দোলায়।

খোকার কথা বল। কী বলেছেন মোক্তার সাহেব?

খোকার লাশের কাছে নিয়ে বলেছে, এই দ্যাখ কাদের মাস্টারের ছেলে। তারপর লাঠি দিয়ে মোক্তার সাহেবের তলপেটে বার বার খোঁচা দিয়েছে।

কেন?

ইতস্তত করে সিরাজ।

কেন খোঁচা দিয়েছে?

লাশের ওপর প্রস্রাব করতে বলে।

সিরাজ বলে, অনেকবার খুঁচিয়েছে। তারপর উনি অজ্ঞান হয়ে যান। ওরা হয়তো করেছে।

শিউরে ওঠে বিলকিস। নিঃশব্দ অস্থিরতায় সে মাথা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। তবু চোখের ওপর থেকে সরে যায় না। খোকার মুখ সে দেখতে পায়।

ও কী করেছিল। সিরাজ? ওদের এত রাগ কেন?

ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখে সিরাজ। কান খাড়া করে। এক পা এগিয়ে যায়। দোকানের আড়াল থেকেই গলা বাড়িয়ে দেখে। তার পর হাত নেড়ে ইশারা করে বিলকিসকে।

চলে আসুন। আমি আগে যাচ্ছি। ওপারে গিয়ে হাত দেখালে আসবেন।

প্রায় হামা দিয়ে সড়কটা পার হয়ে যায় সিরাজ। মিলিয়ে যায় ওপারের দুবাড়ির মাঝখানে আটকে পড়া অন্ধকারে। আবার তাকে দেখা যায়, খুব অস্পষ্টভাবে। সিরাজ গলা বাড়িয়ে আবার ডাইনে-বায়ে দ্যাখে। তারপর হাত তুলে সংক্ষিপ্ত ইশারা করে অন্ধকারে গলা টেনে নেয়।

ঘোলাটে চাঁদের আলোর ভেতরে সড়কটা পেরুতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে নিজেকে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে স্তম্ভিত বলে বোধ হয় বিলকিসের। অন্ধকারের নিরাপত্তা উষ্ণ মনে হয়। সিরাজ তার হাত ধরে, কোনো কথা না বলে দু বাড়ির ফাঁক দিয়ে দ্রুততর করে টেনে নিয়ে যায়। অনেকটা দূরে গিয়ে একটা জলা জায়গা পড়ে। পাকের পচা গন্ধ নাকে এসে জ্বালা ধরায়।

দূরে একটা কুকুর ডেকে ওঠে।

সড়কে টহলদারের পায়ের মসমস শব্দ ছাড়া এই প্রথম জীবিত কারো সাড়া পাওয়া গেল। কান খাড়া করে রাখে তারা। কুকুরটা হয়তো এক্ষুনি ঘেউ ঘেউ করে উঠবে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে টহলদারেরা।

চাপা গলায় সিরাজ বলে, এইজন্যেই সোজা ছুটে এসেছি। এদিকে সরে না এলে ভয় ছিল।

একটা বিপদ পেরুবার উল্লাস লক্ষ করা যায় সিরাজের গলায়।

কুকুরটা ডাকে না।

যাক, এমনিতেই ডেকে ছিল।

আপা, এই জলার ধার ঘেঁষে যেতে হবে। মোটেই জায়গা নেই। ফসকালেই পাঁকে গিয়ে পড়বেন।

জলার ওপারে কবেকার সিংহ বাবুদের লাল একতলা দালান। বহু দিন আগেই কলকাতায় চলে গেছে। ওরা। বাড়িতে কালী মন্দিরের পুরোহিত থাকত। তার কোনো খোঁজ নেই। চাদের আলোয় দরোজা-জানালা ভাঙা দালানটিকে এক ধরনের নির্মাণ বলে বোধ হয়।

আমার হাত ধরুন।

প্রথমে খুব ধীরে পা ফেলে ওরা। তারপর সাহস বাড়ে কিংবা অভ্যাস হয়ে যায়, গতি কিছুটা দ্রুতি পায়।

জলা পেরিয়ে কাছারি পাড়ার পেছন দিয়ে অনেকটা যাওয়া যাবে। প্রায় অর্ধেক রাস্তা।

পাঁকের ভেতর হঠাৎ পা বসে যায় বিলকিসের। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠতেই সিরাজ তাকে দুহাতে টান দেয়। কাদায় সংক্ষিপ্ত মন্থর শব্দ উঠে আবার সব নীরব হয়ে যায়। বিলকিসের দ্রুত শ্বাস নেবার শব্দ শোনা যায়।

দাঁড়াও, শাড়িটাকে ঠিক করে নিই।

এখন চলে আসুন, ওপারে গিয়ে করবেন। সাপ-খোপের জায়গা।

ওপারে এসে বিলকিস হাঁপাতে থাকে।

একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?

না, না।

একটা জায়গায় জন্ম নিলেই কি তার প্রতিটি ধূলিকণা, গাছ, আকাশ, চাঁদ, বাড়ি চেনা হয়ে যায়? কাছারি পাড়ার পেছনে যে এত ঘন বন, আগে কখনো জানা ছিল না বিলকিসের। পাড়ার সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছে। পেছন থেকে এখন পাড়াটিকে সম্পূর্ণ নতুন আর অচেনা মনে হয়।

ঠিক বন নয়। অসংখ্য আম, লিচু, জামের গাছ। বকশি বাবুদের বাগান বাড়ি ছিল।

বকশি বাবুদের বাগানে রাস্তা ভালো, আপা। শুধু খেয়াল রাখবেন, অনেক শুকনো পাতা তো, শব্দ না হয়। এখান থেকে সোজা শর্টকাট করে পোস্টাপিসের পেছনে গিয়ে পড়ব। তারপর বাজারের রাস্তা। আগে পোস্টাপিস পর্যন্ত যাই তো।

যে সিরাজ আলেফ মোক্তারের বাসায় ইতস্তত করছিল, আপত্তি করছিল, সেই সিরাজই এখন হাল হাতে নিয়েছে।

চাঁদের আলোয় বিচিত্র হয়ে উঠেছে বনের তলদেশ।

বিলকিস বলে, তুমি তো বললে না, ওদের এত রাগ কেন খোকার ওপর?

খোকা ভাইয়ের খুব ভালো গলা ছিল গানের।

রংপুর রেডিও থেকে দুদিন গান করেছিল। ঢাকায় আমার কাছে আসতে চেয়েছিল। ঢাকা রেডিও থেকে গান গাইবার খুব শখ ছিল। তুমি চিনতে খোকাকে?

চিনতাম। আলাপ ছিল না আপা।

কেন খোকার লাশের ওপর ওরা ওরকম করল?

বোধহয়, গান গাইত, খোকা ভাই এখানে সবাইকে আমার সোনার বাংলা শিখিয়েছিল। মার্চ মাসের মিছিলগুলোতে খোকা ভাই সবার আগে থাকত, একেকটা মোড়ে দাঁড়িয়ে সকলে আমার সোনার বাংলা গাইত। সবার চোখে পড়ে গিয়েছিল খোকা ভাই। কেন পালিয়ে যায় নি?

সকলে তো পারে না। আমিও পারি নি।

মা বুড়ো মানুষ। বোধহয় তাই যায় নি।

খোকা ভাই কিন্তু মোটেই পথে বেরুত না। কী করে যে ধরা পড়ল?

বাড়ি থেকে?

না। মকবুলদা বলল, ছেলেরা যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরে যেতে বলে, খোকা ভাই তখন বাড়িতে ছিল না।

কোথায় গিয়েছিল তবে?

নীরবে দুজনে বাগানটা পেরোয়। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফাঁকে ফাঁকে এখনই দেখা যাচ্ছে পোস্টাপিসের হলুদ দালান। দালানের পাশ ঘিরে ছোট একটা বাঁশবন। পতাকাশূন্য দণ্ডের মতো খোলা আকাশে স্থির হয়ে আছে।

৮. লাশ আর লাশ

তারপর সেই দৃশ্য দেখা যায়। বাজারের খোলা চত্বরময় ছড়িয়ে আছে লাশ! বেড়াহীন উলঙ্গ দোকানের খুঁটি আঁকড়ে পড়ে আছে লাশ। আলোর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে গলিটা, তার ওপরে উপুড় হয়ে আছে লাশ। লাশের পর লাশ। এক, দু, তিন, চার, ছয় সারি চোখে পড়ে–বাজারে হয়তো ফল বেচাতে এসেছিল গাছের, দুটো বাচ্চা উল্টে থাকা গরুর গাড়ির ছাউনি জড়িয়ে ধরে–লাশ; সমস্ত চত্বর আর খালের ঢালু জুড়ে ইতস্তত বাঁশের গোল গোল ঝাকা, কলস, সবজি; আর সমস্ত কিছুর ওপরে স্তব্ধতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তনের আশাহীন অক্ষমতা।

মৃত্যুর মতো স্পন্দনহীন হয়ে যায় দুজন। বাস্তবের অতীত অথচ সত্যের সীমানার অন্তর্গত দৃশ্যটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে বিলকিস আর সিরাজ।

তারপর, দুজনেই একসঙ্গে, রক্তের ভেতরে অভিন্ন বোধ প্রবাহ নিয়ে একে অপরের দিকে তাকায়। ক্ষণকাল পরে সিরাজ হঠাৎ মুখ ঢাকে দুহাতে। টিনের বেড়ার ওপর মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চল হয়ে যায়।

বিলকিস আবার ফিরে তাকায় চাঁদের মেঘাক্রান্ত আলোয় উদঘাটিত চত্বরের দিকে। খোকার মুখে প্রস্রাব করে দেবার কথা শোনার মুহূর্ত থেকে যে ক্রোধ তার ভেতরে তলোয়ারের মতো খাড়া হয়ে ছিল, এখন তা ঝলসে ওঠে। তার দ্যুতিতে ম্লান হয়ে যায়

সব কিছু। লাশগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না তার। সে সমুখের দিকে পা ফেলে।

ছায়ার মতো কী একটা অপসৃত হয়!

বিলকিসের চেতনায় সেই ছায়া কোনো রেখাপাত করে না।

কিছুটা দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লাশের দিকে স্থির চোখ রেখে সে এগোয়। অচিরে সে পাট গুদামের ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে; আসে খোলা আলোর নিচে, অস্পষ্ট তার ছায়া তাকে অনুসরণ করে; সে এগিয়ে যায়।

বিস্ফারিত চোখে সিরাজ তাকিয়ে দ্যাখে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে। তার মনে হয়, ঘুমন্ত অনেকগুলো মানুষ, তার ভেতরে প্রেতের মতো হেঁটে চলেছে এক রমণী; সেই রমণীকে বর্তমানের মনে হয় না, অতীতেরও নয়, কিংবা কোনো আগামীর। স্তম্ভিত সময়ের করতলে ক্ষণকাল ছবিটি উদ্ভাসিত থেকে নাতিধীর গতিতে মলিন হয়ে যায়।

সিরাজ তাকিয়ে দ্যাখে, এক খণ্ড ধূসর মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। ধূসর সেই মেঘের পেছনে অতি দ্রুত গতিতে আরো অনচ্ছ আরো ধূসর মেঘ ছুটে আসে এবং চাঁদটাকে গ্রাস করে ফেলে।

সম্মুখে তাকিয়ে দ্যাখে, বিলকিসকে আর দেখা যায় না।

লাশগুলোকে খণ্ডিত কিছু অন্ধকার বলে বোধ হয়।

চত্বরে দৌড়ে যায় সে। প্রথমে খুঁজে পায় না বিলকিসকে। যেন এই বাস্তবতাকে নিঃশব্দে গ্রাস করে ফেলেছে অথবা মৃতেরা তাকে দলে টেনে নিয়েছে।

পায়ের কাছে নরম একটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় সিরাজ। দ্যাখে, বিলকিস মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একটি লাশের মুখ উপুড় হয়ে দেখছে।

মধ্যবয়সী কৃষকের চোখ দুটি বিস্ফারিত, ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছিল, জমাট বেঁধে আছে; দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে একটু, যেন সাক্ষাতে সাড়া দিয়ে মৃদু হাসছে।

বিলকিসকে টেনে তোলে সিরাজ–আপা।

বিলকিস স্থির কণ্ঠে বলে, এত লাশ, সিরাজ!

চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিপাত করে সিরাজ হাত ধরে টান দেয়–এদিকে আসুন।

একটা চালার আড়ালে তাকে টেনে এনে সিরাজ তিরস্কার করে। আপনার কি মাথা খারাপ? কে কোথায় আছে না আছে।

না। নেই।

কী করে বুঝলেন?

একটা শিয়াল দৌড়ে গেল। শেয়াল মানুষ থাকলে আসত না।

সিরাজ কান খাড়া করে। কিছু শুনতে পায় না কোথাও। কেবল খালপাড়ে জলের মৃদু অনবরত অভিঘাত বেজে চলে। শ্রুতির ভেতর যতটা নয়, আত্মার ভেতর দিয়ে জলের সেই শব্দ বয়ে যায়।

তবু সাবধান হবেন না?

আবার চারদিকে তাকায় সিরাজ।

জানেন, ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে? হুকুম দিয়েছে লাশ কেউ ছুঁতে পারবে না। কাছে এলেই গুলি করবে।

জানি।

ওরা কি একা ফেলে রেখেছে, মনে করেন? কখনো না।

তুমি ফিরে যাও, সিরাজ।

আপনি?

আমি খোকাকে খুঁজে বের করব। নিজের হাতে মাটি দেব।

চাঁদ মুক্ত হয়ে যায়। যখন তারা চত্বরের দিকে তাকায় কাফনের মতো ধবধব করে সবকিছু। বিলকিস বলে, আমার মৃত্যুভয় নেই। সিরাজ। আমি পারব ওদের হুকুম উপেক্ষা করতে। সিরাজ কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আপা, আপনি মনে করেন, প্রাণের আমার মায়া আছে? আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলে নি, আমার বোনকে ওরা নিয়ে যায় নি?

সিরাজের কাঁধে হাত রাখে বিলকিস। চুপ। কাঁদতে নেই।

আমি কাঁদছি না। আমি আর একটা বোন হারাতে চাই না।

বিলকিস এক মুহূর্ত সময় নেয় কথাটা বুঝতে। তারপর সিরাজকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ছিঃ কাঁদে না। কাঁদতে নেই। আমি কি চাই না। আমার ভাই আমার সঙ্গে থাকবে, আমরা এক সঙ্গে খোকাকে কবর দেব?

বাজার সড়কের শেষ বাঁকে, পাট গুদামের সারিগুলো পেরিয়ে, ব্যাপারিদের টিনের আপিসঘর ছাড়িয়ে চত্বরটা চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যে দুলে উঠেছিল। এতক্ষণে তা স্থিরতর হয়।

যেন দূরের একটি লক্ষ্যস্থল স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে যায়।

বিলকিস আর সিরাজ নিঃশব্দে চত্বরে নামে।

বিলকিস ফিসফিস করে বলে, তুমি ঠিক বলেছ, ধরা পড়ে গেলে খোকাকে কবর দিতে পারব না।

আপা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। বসে পড়ি।

ধরা পড়তে চাই না, সিরাজ। আমরা ধরা পড়তে চাই না। ধরা না পড়ে, খোকাকে কবর দিয়ে, আমি দেখিয়ে দিতে চাই, খোকা মানুষ, খোকা পশু নয় যে তার লাশ পড়ে থাকবে।

বিলকিস কথাগুলো একটানা বলে না। থেমে থেমে বলে, আর হামাগুড়ি দিয়ে একেকটা লাশের কাছে যায়। তার মুখ ফিরিয়ে দ্যাখে, আবার নিঃশব্দে নামিয়ে রাখে। সব লাশের কাছে যায় না। মুখ না দেখেও বোঝা যায়। পোশাক দেখে অনুমান করা যায়, খোকা নয়, দোকানদার, বাজারের কুলি, গ্রামের গৃহস্থ।

দূরে একটা লাশ দেখে দুজনেই একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে।

পরনে ট্রাউজার, গায়ে হাফশার্ট, পেটে হঠাৎ ব্যথা উঠলে মানুষ যেভাবে যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পেট চেপে ধরে, অবিকল সেই ভঙ্গিতে পড়ে আছে। তার শরীরের গড়ন দেখে যুবক মনে হয়।

খোকা?

মুখ দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সিরাজ।

কে?

এরফান।

আস্তে করে মাথাটা নামিয়ে রাখে বিলকিস।

ভালো ফুটবল খেলত এরফান। ফুটবলের জন্য পড়া হয় নি। বাজারে লাইব্রেরি দিয়েছিল।

অদূরে আরও একটি যুবকের লাশ চোখে পড়ে। তার মুখ পোশ ফেরানো। বুকের কাছে পা ভাঁজ করে, শীতের দিনে পাতলা কাঁথার নিচে শুয়ে থাকার মতো গুটিশুটি হয়ে আছে। একটা হাত, যেটা ওপরে, পেছনের দিকে টানটান প্রসারিত।

নান্টু।

কোন বাড়ির?

ভোলা ডাক্তারের বড় ছেলে। বিলকিসের মনে আছে ভোলা ডাক্তারকে। ছোটবেলায় কত ওষুধ খেয়েছে তার। বায়না ধরলে মাঝে মাঝে ছোট শাদা মিষ্টি বড়ি দিতেন খেতে। জলেশ্বরীর সবচে নামকরা হোমিওপ্যাথ।

বিলকিস বলে, নাটুকে কতদিন দেখি নি!

নান্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিলকিস। আবার ঝুঁকে পড়ে দ্যাখে। আলতো একটা হাত রাখে নান্টুর গালে। তার বিস্ময় যায় না, সেই ছোট্ট নাটু কত বড় হয়ে গেছে! দাড়ি কামায় এখন। মুখের আদালটা একটু একটু করে স্মৃতির ছোট ছেলেটির সঙ্গে মিলে যায়।

নান্টু এত বড় হয়েছিল?

সিরাজ এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। নাটুকে সে এভাবে দেখতে পারছিল না। মুখ ফিরিয়ে রেখেই সে অবরুদ্ধ গলায় বলে, সময় চলে যাচ্ছে, আপা।

দাঁড়াও। নাটুকে ভালো করে শুইয়ে দি।

তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আঁধারে আবার তারা এগোয়। খোকাকে তবু পাওয়া যায় না। সিরাজ, খোকাকে ওরা নিয়ে যায় নি তো?

না। মনে তো হয় না।

খোকা সত্যি এখানে ছিল?

মকবুলদা, আলেফ মোক্তার, দুজনেই বলেছেন। আলেফ মোক্তারকে, বললাম না, ওরা কী করতে বলেছিল?

লাফ দিয়ে ক্রোধ ফিরে আসে। সটান হয়ে দাঁড়ায় বিলকিস।

সিরাজ, শোনো।

বিলকিসের কণ্ঠস্বরে কী ছিল, ভয় পেয়ে যায় সিরাজ।

সে উঠে দাঁড়াতেই বিলকিস তার হাত শক্ত করে ধরে, সিরাজ, আমরা সবাইকে কবর দেব। হাঁ, সবাইকে।

খোকা ভাইকে খুঁজব না?

খুঁজতে হবে না। খোকা এখানেই আছে। একটার পর একটা কবর দিতে দিতে খোকাকেও আমরা পেয়ে যাব।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নীরবতা প্রথম ভাঙ্গে বিলকিস। আগে একটা জায়গা দেখতে হয়।

উল্লেখ করতে হয় না, কীসের জায়গা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সিরাজ বলে, বেশি দূরে তো যেতে পারব না খালপাড়ের মাটি নরম আছে। সেখানে কবর দিলে আপনাদের কোনো কিছু অশুদ্ধ হবে না তো?

বিস্মিত হয়ে বিলকিস সিরাজের দিকে তাকায়–আমাদের মানে?

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সিরাজ। থতিমতো খেয়ে বলে, আমি ঠিক জানি না। কবর কীভাবে দেয়। গোরস্তানে যেতে পারব না, তাই বলেছিলাম। খালপাড়ে কবর দিলে অসম্মান হবে। কিনা, আর কিছু না। আচ্ছা, আমি না হয় দেখে আসি।

সিরাজ গলি দিয়ে খালপাড়ের দিকে চলে যাবার পরও বিস্ময়টুকু তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। তারপর চত্বরের দিকে চোখ পড়তেই বলবান বাস্তব সমস্ত কিছুকেই পরাজিত করে ফেলে মুহূর্তে। লাশগুলোর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনের ভেতরে ছবি তুলতে চায় বিলকিস, আজ দুপুরে কী হয়েছিল।

আলেফ মোক্তার লাইন করে দাঁড় করাবার কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে যায়। নান্টু আর এরফানের লাশ–দেখে অনুমান করা যায়, এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাহলে খোকা কি লাইনে ছিল না। দ্বিতীয় একটি লাইন করা হয়েছিল। শুধু দুটি? তৃতীয় লাইন কি হয় নি?

আবার কিছু বিক্ষিপ্ত লাশ দেখে, তাদের হাতের কাছে ঝাকা, ব্যাগ, সবুজি দেখে মনে হয়, বেপরোয়া গুলি চলেছিল অকস্মাৎ। মানুষগুলো দৌড়ুতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

কোনটা আগে হয়েছিল? লাইন করিয়ে গুলি, না, বাজারের জনতার ওপর গুলি?

আপা, খালপাড়ে একটা গর্ত করা আছে। আপনি দেখবেন?

দুসারি দোকানের ভেতর দিয়ে খালের দিকে গলি। কোনো দোকানে ঝাঁপ ফেলা নেই। ভেতরের তাক, আলমারি, আসন সব ভেঙেচুরে উল্টে, হা খোলা পড়ে আছে।

লুটও করেছে ওরা।

তা করবে না? এর আগেও দুবার লুট করেছিল।

বিলকিস এমনভাবে হেঁটে যায়, যেন ধরা পড়বার ভয় নেই। হয়তো ধরা পড়বার কথা সে ভুলে গেছে অথবা এতক্ষণে নিশ্চিত হয়েছে, বাজারে কেউ পাহারায় নেই।

সিরাজ যাকে গর্ত বলেছিল, ঠিক গর্ত নয়। খালপাড়ের ভাঙন ঠেকাবার জন্যে বাঁশের বেড়া লম্বা করে দেওয়া আছে। তবু ভেতর থেকে মাটি খসে যায় বলে মাঝে মাঝে মাটি কেটে ভরাট করতে হয়। সেই মাটি কেটে নেবার দরুন কিছুটা দূরে পাগারের মতো হয়ে আছে। তার ভেতর নেমে পড়ে বিলকিস। মাটিতে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। মাটি ঝুরঝুরে নরোম বালির মিশেল।

উৎসুক চোখে সিরাজ তাকিয়ে থাকে বিলকিসের দিকে।

বিলকিস বলে, তবু একটা দিক আরো একটু খুঁড়তে হবে। ওদিকে গর্ত কম। তারপর সে গর্তের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একবার হেঁটে আসে। বলে, খুব হলে আট নজনের মতো জায়গা হবে। আরেকটা বড় কবর খুঁড়তে হবে যে!

আগে যেটা আছে, আমরা কবর দিয়ে নি?

তা ভালো।

সিরাজ ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে। এমন একটা কিছু সে খোজে, যা দিয়ে গর্তটা গভীর করা যায়। কিন্তু কিছু চোখে পড়ে না।

বিলকিস বলে, বাজারে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

দুজনে আবার উঠে আসে চত্বরে। এ দোকান সে দোকান উঁকি দেয়, অন্ধকারে ভালো ঠাহর করা যায় না। কোদাল বাঁ খন্তা জাতীয় কিছুই চোখে পড়ে না। লাশগুলোও এখন আর তাদের নিশ্চল বাঁ স্তম্ভিত করে না। যেন এ ব্যাপারে অনেক আগেই একটা নিস্পত্তি হয়ে গেছে; লাশগুলো সহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছে তাদের শেষকৃত্যের।

হঠাৎ টিনের একটা টুকরো পাওয়া যায়। আঁশটে গন্ধ। এমনকি মাছের আঁশ লেগে আছে। জেলেদের কেউ ঝাকার ওপর এই টিন বিছিয়ে মাছ বেচত।

এটাই বেশ।

সিরাজ সায় দেয়।

আরেকটা দরকার।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আঁশটে গন্ধ ধরে এগোতেই মাছ-এলাকায় এ রকম আরো কয়েকটা টিনের টুকরো পাওয়া যায়। দুজনে টিন দুটো নিয়ে তরতর করে ফিরে যায়। খালপাড়ে।

যতটা সহজ মনে হয়েছিল, মাটি যত নরম মনে হয়েছিল, ঠিক তা নয়। বালির পাতলা স্তরের পরেই কালো শীতল এঁটেল মাটির পুরু স্তর। সর্বাঙ্গে মাটি-কাদা মাখামাখি হয়ে যায়। তবু একরোখার মতো দুজনে গর্ত গভীর করে চলে। চাঁদ কখনো আলো দেয়, কখনো মেঘের আড়ালে কৃপণ হয়ে যায়।

আধা ঘণ্টাখানেক খুঁড়বার পর বিলকিস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, এই থাক।

এতক্ষণে টের পায়, পিঠ টনটন করছে। গর্তের খাড়াইতে বসে পড়ে বিলকিস। বসে। হাঁপাতে থাকে। সিরাজও এতক্ষণ পরিশ্রম করে ঘামে ভিজে উঠেছিল। এক হাতে কপালের ঘাম মুছে সেও বসে পড়ে।

বিলকিস বলে, লক্ষ করেছ সিরাজ, সারা বাজারে কটা পাহারা নেই?

হাঁ, তাই দেখছি।

সিরাজ তবু সাবধানী দৃষ্টিপাত করে চারদিকে। খালের অপর পাড়েও দেখে নেয় সে। ফসলের মাঠের পর কালো ফিতের মতো অন্ধকার গাছপালার সার।

হুকুম শুনে মনে হয়েছিল, দিনরাত পাহারা দিয়ে আছে।

আশ্চর্য!

কীসের আশ্চর্য, সিরাজ? রাতের অন্ধকারকে ওরা ভয় করে।

সিরাজ তবু সতর্কতা ত্যাগ করে না। ঘন ঘন সে মাথা ফিরিয়ে ডানে-বায়ে দেখে নিতে থাকে।

বিলকিস উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যেখানে সবচে কঠিন হুকুম জারি করেছিল, সেখানেই ওদের সবচে বেশি ভয়।

আমার মনে হয়, তবু আমাদের তাড়াতাড়ি করা দরকার।

সিরাজও উঠে দাঁড়ায়।

খালপাড়ে উঠে গিয়ে নিচে কবরটার দিকে ফিরে তাকায় দুজনে। গর্তের শূন্যতাকে বাস্তবের চেয়েও অনেক গভীর এবং ব্যাপকতর বলে বোধ হয়।

গলিটা চত্বরে গিয়ে পড়বার মুখেই একটা লাশ কাৎ হয়ে পড়েছিল। মধ্যবয়সী গরীব কোনো রমণী। খাটো শাড়ি হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। বুক খোলা। নিচের চোয়াল বিকৃত হয়ে এক পাশে ঠেলে সরে গেছে। রুক্ষ চুলে আধখানা ঢেকে আছে তার মুখ।

নীরবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। রমণীটিকে দিয়েই শুরু করে।

সন্তর্পণে, যেন এখনও প্রাণ আছে–ব্যথা পাবে, বিলকিস রমণীর হাত দুটি মুক্ত করে নেয়, পাঁজরের নিচ থেকে।

তুলতে পারলে ভালো হতো।

তোলা মুশকিল হয়ে পড়ে। মানুষ মৃত্যুর পরে ভারী হয়ে যায়। আত্মাই মানুষকে লঘু রাখে। যতক্ষণ সে জীবিত, পাখির মতো উর্ধে উঠে যাবার সম্ভবপরতাও তার থাকে। প্রাণ এবং স্বপ্নের অনুপস্থিতিতে মানুষ বিকট ভারে পরিণত হয়। লাশটিকে তখন টেনে নিয়ে যায় ওরা, আস্তে আস্তে গলিটা পার হয়ে ঢালু বেয়ে নিচে নামে। তার পর গর্তের এক প্রান্তে শুইয়ে রেখে আবার ওরা ফিরে যায় চত্বরে। আবার একটি লাশ আনে। প্রথমে যাকে পায় তাকেই আনে। এমনি করে করে ছটি লাশ নামিয়ে আনে তারা। বিলকিস অনুমান করেছিল আট নজনের মতো সংকুলান হবে। দেখা যায়, ছজনেই আর জায়গা নেই। তখন মুহূর্তের জন্য অবসন্নতা পেয়ে বসে দুজনকেই। মোট কত লাশ গুণে দেখে নি, কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় কবরের যে দরকার হবে, তা তারা অনুভব করে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিলকিস বলে, হয়তো এখানেই বাচ্চা দুটোর জায়গা হয়ে যাবে।

পায়ের দিকে কিছুটা জায়গা খালি আছে। সেদিকে তাকিয়ে সিরাজ বলে, আপনি উত্তর দিকে মাথা দিতে বললেন, বাচ্চাদের তো উত্তর দিকে হবে না।

না হোক।

সিরাজ তবু ইতস্তত করে।

দেরি করো না।

দুজনে বাচ্চা দুটোকে কোলে করে নিয়ে আসে খলপাড়ে। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে কী জ্বলজ্বল করছে দুটো! এক পলকের জন্যে শীতল হয়ে যায় শিরদাঁড়া। পরীক্ষণেই বুঝতে পারে–শেয়াল। মৃতের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে জীবিত দুজনকে সে অতটা ভয় করে নি। অথবা পশু তার রক্তের ভেতরে অনুভব করতে পেরেছে, এরাও প্রায় মৃত কিংবা অবসন্ন।

তাড়াতাড়ি কবরের ভেতরে বাচ্চা দুটোকে পায়ের কাছে শুইয়ে দেয় ওরা। ফিরে তাকিয়ে দেখে, শেয়ালটা সেখানে আর নাই। চারদিকে দৃষ্টিপাত করেও তার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবরের ভেতর থেকে উঠে আসে ওরা। ওপরে দাঁড়িয়ে বিলকিস বলে, তুমি কি জান, মাটি দেবার সময় কোন সূরা দোয়া পড়তে হয়?

সিরাজ চুপ করে থাকে কবরের ভেতরে শায়িত লাশগুলোর দিকে চোখ রেখে।

তুমি আল্লাহ বিশ্বাস কর?

সিরাজ বিলকিসের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে কয়েকবার ঠোঁট কেঁপে ওঠে তার।

সিরাজ বলে, না।

বিলকিস সচকিত হয়ে সিরাজের দিকে তাকায়। তারপর নিজেই অনুভব করে তার নিজের ঠোঁট প্রসারিত হচ্ছে। বড় পরিচিত সেই সম্প্রসারণ–খুব ভেতর থেকে, সুদূর থেকে হাসি পেলে ঠোঁটের পেশিতে এই পরিবর্তন হয়।

বিলকিস বলে, তাহলে, আমরা না হয় বলি, যে মাটি থেকে এসেছিলে সেই মাটিতে ফিরে যাও।

ঝুঁকে পড়ে দুমুঠো মাটি তুলে নেয় দুজন। সযত্নে ধীরে কবরের ভেতর মাটি ঝরে পড়ে জীবিত দুটি মানুষের আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে। হাত শূন্য হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

সিরাজ?

দিদি।

হয় আমাকে আপা বল, না হয় দিদি! হাত চালাও, মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে না?

যতটুকু মাটি সদ্য খুঁড়ে তোলা হয়েছিল তাতে অর্ধেক কবর কোনো রকম ভরাট হয়। আবার তারা সেই টিনের টুকরো দুটি হাতে নেয়। পাড় থেকে ঢালু মাটি কেটে আনতে সুবিধে হয়। সেই মাটি এনে ভরে দিতে থাকে কবর।

ঠিক তখন পটপট করে গুলি শোনা যায়।

৯. শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস

সঙ্গে সঙ্গে পাড়ে ঢালুর ওপর ছিটকে উপুড় লম্বা হয়ে পড়ে বিলকিস আর সিরাজ। একবার মনে হয় খালের ওপার থেকে, আবার মনে হয় বাজারের দিক থেকে শব্দটা আসছে। শব্দ থেমে যায়, শব্দের অনুপস্থিতির ভেতরেও তারা দীর্ঘ অনুরণন শুনতে পায়। তারপর স্তব্ধতা ফিরে আসে।

কোথায়?

বুঝতে পারছি না।

গুলির শব্দ আর ফিরে আসে না। খালের অপর পাড়ে তাকিয়ে আগের মতোই সব কিছু মনে হয়। বাজারের দিকেও কোনো মানুষের সাড়া বাঁ পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না।

আস্তে গা ছেড়ে দেওয়াতে ঢালু বেয়ে কবরের পাশে এসে পড়ে তারা। সময় পেলে মাটি সমান করে দেওয়া যেত, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে, আগে বুঝে দেখা দরকার।

এখানে থাকা বোধহয় ঠিক হবে না, সিরাজ।

গুলিটা কোনদিকে হলো, বুঝতে পারলে হতো।

আমার মনে হয় দূরে কোথাও।

খুব দূরে নাও হতে পারে।

এখনো অনেক লাশ বাকি।

খোকা ভাইকে পেলেও হতো।

খোকাকেও আমরা মাটি দেব, সিরাজ। ফিরে যাব না।

ভীত কণ্ঠে সিরাজ বলে, রাত তো বাকি নেই।

তাহলে কাল আবার আমরা শুরু করব।

কিন্তু এখান থেকে এখন চলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

এখানে?

হ্যাঁ, এখানে। এত বড় একটা বাজার, একটা দিন লুকিয়ে থাকা যাবে না?

খুব মুশকিল হবে।

এর চেয়ে অনেক বড় মুশকিলের ভেতরে আমরা আছি। বাজার থেকে এখনো কোনো শব্দ পাচ্ছি না, আপা।

বিলকিস কান খাড়া করে এখনো শোনবার চেষ্টা করে।

বাজারে কেউ নেই।

তাহলে কী করবে?

আগে এসো, মাটি সমান করে দিই। কবরের। লাশের তাতে কোনো লাভ নেই। আমাদের মন বলবে, একটা কাজ আমরা ভালো করে শেষ করেছি।

আপা, আমার একটা কথা মনে এল।

কী, সিরাজ?

এত কুঁকি নিয়ে এলাম, কবর দিলাম, যারা মরে গেছে তাদের তো কোনো লাভ নেই।

নেই? কে বললে নেই?

আমি তো দেখি না।

ঐ যারা মরে গেছে, তুমি ওদের আলাদা করে দেখছ বলেই একথা বলতে পারছি। যদি মনে করতে পারতে ওরা তোমারই অংশ, তাহলে দেখতে ওদের সংকার করে তুমি জীবনকে শ্রদ্ধা করছ, সম্মান দিচ্ছ।

টিনের সেই টুকরো দুটো দিয়ে কবরের মাটি সমান করে উঠে দাঁড়ায় ওরা। গলিপথে এসে থামে। তারপর সন্তর্পণে চত্বরের মুখে গিয়ে সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে নেয়। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আগের মতোই সব মনে হচ্ছে। তবু সাবধানের সঙ্গে পা ফেলে। দোকানগুলোর গা ঘেঁষে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যথাসম্ভব মিশে থেকে চলে।

কোথায় যাবেন?

আমি ঠিক করে ফেলেছি। এসো আমার সঙ্গে।

বাজারের চত্বরটা পেরিয়ে পাটগুদামের পাশে টিনের ঘরগুলোর ছায়ায় দাঁড়ায় বিলকিস। সেখান থেকে লাশগুলোর দিকে আবার পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ চোখে সে তাকায়।

সিরাজ, যদি পারতাম, আজ রাতে আমি সবাইকে মাটি দিতাম। দেখতাম ওদের হুকুম কত বড়! ওরা দেখত আমরা পশু নই, আমরা আমাদের মৃতদেহ ফেলে রাখতে দেই না, আমরা শকুনের খাদ্য হতে চাই না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিলকিস আবার বলে, আমাদের দুটি করে মাত্র হাত, লাশ তো অনেক।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

তাই তো।

আকাশ ফিকে হয়ে আসছে।

সিরাজ, এই পাট গুদামগুলোর কথা ভাবছিলাম। এর ভেতরে নিশ্চয়ই আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব।

সারাদিন?

দরকার হলে দিনের পর দিন। খোকাকে, সবাইকে কবর দিয়ে, তবে আমি যাব।

গুদামের বড় বড় লোহার দরোজা বিরাট তালা দিয়ে আটকানো। দুএকটাতে টান দিয়ে দেখে সিরাজ, যদি দৈবাৎ খোলা থাকে। অবশেষে ব্যাপারিদের টিনের আপিস ঘরের পাশে দরোজা-জানালাহীন ছোট একটা গুদামের দরোজায় দেখা যায় আংটা দুটো পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা। তালা নেই। সন্তর্পণে ভেতরে সরে যায় ওরা। একটু পর আবার আসে। ধীরে, অতি ধীরে দরোজা একটু ফাঁক করে প্রথম সিরাজ ঢোকে, তারপর বিলকিস।

ভেতরে ঢুকতেই সারা গায়ে যেন আগুনের হালকা লাগে, ভেতরটা এত গরম। আর সেই সঙ্গে তীব্র খসখসে গন্ধ। বোধ আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চায়। এক ধরনের নেশায় মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। চোখের সম্মুখে অন্ধকার সূচীভেদ্য মনে হয়। পেছনে সামান্য ফাঁক করা দরোজায় তরল আঁধারের রিবনটিকে উজ্জ্বলতর দেখায়।

সিরাজ চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, এখানে থাকতে পারবেন না, আপা।

পারতেই হবে।

পাটের ভীষণ গরম হয়। দুএক ঘণ্টার ব্যাপার না। সারাদিন থাকলে মরে যাবেন।

দরোজটা সাবধানে বন্ধ করে দাও।

দরোজা বন্ধ করে দিতেই কবরের মতো নিরেট হয়ে যায় ভেতরটা। হাতড়ে হাতড়ে একটু এগিয়ে এসে সিরাজ ফিস ফিস করে ডাকে–আপা। সাড়া পায় না। আবার সে

হাতড়ে হাতড়ে কিছুদূর এগোয়। যতদূর হাত পৌছোয় ওপরে। পাহাড়ের মতো স্তুপ করা পাট। আরো খানিক এগোতে আর পথ পায় না। সে আবার ডাকে–অপ। অকস্মাৎ তার মনে হয় সে একটা দুঃস্বপ্নের ভেতরে আকণ্ঠ ডুবে আছে, বিলকিস তাকে ছেড়ে গেছে, এখান থেকে আর কোনোদিন সে বেরুতে পারবে না। হয়তো আর্তনাদ করে উঠত, এমন সময় বিলকিসের গলা শোনা যায়।

সিরাজ, তুমি কোথায়?

পিছু হটে এসে একটা খোলা জায়গা অনুভূত হতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আপা।

বিলকিসের হাত তার গায়ে ঠেকতেই হাতটা আঁকড়ে ধরে।

আপা, কী অন্ধকার!

ভয় করছে?

আপনার সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি ওদিকটা হাতড়ে দেখে এলাম। সারা ঘরে পাটের বেল। এক্ষণি একটা দুটো টেনে দরোজার ওপরে ঠেসে রাখা দরকার। বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা কেউ করলে বাধা পাবে। এসো।

বিলকিস তার হাত ধরে বাঁ দিকে নিচু একটা স্তুপের দিকে নিয়ে যায়। দুজনে মিলে একটা বেল সরাতে প্রাণান্ত হয়ে যায় তাদের। কিন্তু মানুষের শক্তি আসে তার প্রয়োজনের মাত্রায়। অচিরেই তারা একটা বেল এনে দরোজার কাছে ঠেলে ফেলে।

আরো একটা হলে ভালো হয়।

আরো একটা বেল এনে দরোজার আরেক পাটে রাখে। দরোজার কাছে কিছুটা হাওয়া, পাটের প্রচণ্ড গরমের তেজ কিছুটা পরিমাণে সহনীয়। তবু দরোজার কাছে বসা ঠিক নয়। সিরাজের হাত ধরে বিলকিস তাকে আবার অনন্ত অন্ধকারের গহবরে নিয়ে যায়। অনুমানে বোঝা যায়, দুদিকে দুসার চলে গেছে, মাঝখানে সরু গলির মতো। গলিটার একটু ভেতরে ঢুকে বিলকিস মাটিতে বসে পড়ে।

বোসে।

পাছে গায়ের ওপর পড়ে যায়, সিরাজ অনেকটা সরে, আস্তে আস্তে বসে।

কোথায় তুমি?

এই যে!

খুব যখন ছোট ছিলাম, পাট গুদামে লুকোচুরি খেলতে আসতাম। সবচে মজা কি জান, এর মধ্যে যতই তুমি হাট, চল, কথা বল, মানে খুব জোরে যদি না বল, বাইরে কেন, ভেতর থেকেই কারো টের পাবার জো নেই। লুকোবার জায়গার কথা মনে হতেই ছেলেবেলার খেলা মনে পড়ে গেল। একটা খেলাও পেয়ে গেলাম। তুমি যে তখন বললে, আল্লাহ্ বিশ্বাস কর না, দ্যাখ তো, এখন পর্যন্ত সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কী করে হচ্ছে, কেউ যদি ওপরে না থাকেন?

উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিলকিস।

কই, কিছু বলছি না?

ওপরে কেউ থাকলে আমার মা-বাবা খুন হতেন না, আমার বোনের লজ্জা নষ্ট হতো না, আপনার ভাই গুলি খেয়ে বাজারে পড়ে থাকত না, দিদি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনেছেন? লক্ষ লক্ষ লোককে ওরা মেরে ফেলেছে। বেতার কেন, নিজের হাতে আজ কবর দিলেন না? কতজনকে দিতে পেয়েছেন? তারচে অনেক বেশি পড়ে আছে না, ওদের ছুলে পর্যন্ত গুলি করার হুকুম আছে না? আপনি বলেছেন, ওপরে কেউ আছে। কে আছে? কেউ নেই। থাকলেও ঐ ওদের জন্যে আছে, আমাদের জন্যে নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিরাজের আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। বিলকিস, সে নিজেই কি এখন বিশ্বাস করে আল্লাহকে? নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে বিলকিস? মানুষের মৃত্যু দেখে বরং এখনো তার চোখ ভিজে ওঠে, কিন্তু আল্লাহর ওপর আস্থা হারিয়েও এখন সে বিচলিত বোধ করে না।

তাহলে কেন মিছেমিছি আল্লাহর কথা তুলতে গেল সে? অভ্যাস বলে? রক্তের অন্তর্গত বলে? না, রক্ত থেকেও সে বিদায় দিয়েছে তাকে। জলেশ্বরীতে পা রাখা অবধি, পদে পদে এত ঝুঁকি, এত মৃত্যু, তবু তো সে একবারও আল্লাহকে স্মরণ করে নি?

সিরাজ।

কোনো উত্তর আসে না।

রাগ করেছ?

নীরবতা।

বিলকিস হাতড়ে হাতড়ে একটু এগোয়। সিরাজের শরীর হাতে ঠেকে। তার চিবুকের নিচে হাত রাখে বিলকিস। আঙুল দিয়ে অতি ধীরে বুলিয়ে দেয়।

তোমার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে। তুমি তো একা নও। আমার মা কোথায় আমি জানি না, ভালো আছে কিনা কে জানে, আমার বোন, তার বাচ্চারা। আমি তো ভাইকে হারলাম। ওর সুন্দর মুখটাকে ওরা নোংরা করে দিয়েছে তাই তো শুনতে হলো। আর আমি জানি না, আমি বিধবা না। সধবা। মনের একটা দিক বলে, আলতাফ বেঁচে আছে, আরেকটা দিক হাহাকার করে ওঠে, নেই নেই। আমার মনের ঠিক যে দিকটা বলে নেই ঠিক সেই দিকটাই একদিন আল্লাকে বিশ্বাস করত, বিচার আছে বলে মনে করত, মানুষের ভেতরে মানুষ সব সময়ই আছে বলে নিশ্চিন্ত থাকত।

চিবুকের নিচে বিলকিসের হাতটা হঠাৎ দুহাতে চেপে ধরে সিরাজ।

বড় অকস্মাৎ বড় অপ্রত্যাশিত মনে হয় তার এই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা।

মুহূর্তকাল পরে একই আকস্মিকতার সঙ্গে হাতটা ছেড়ে দিয়ে সিরাজ বলে, দিদি। আমি আপনাকে একটা মিথ্যে কথা বলছি।

তার এই ঘোষণাটি আরো প্রত্যাশিত।

আমি সিরাজ নই। মনসুরদা আমাকে এই নাম দিয়েছেন। আমি প্রদীপ।

প্রদীপ?

শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

তবু তুমি এখানে আছ?

আছি। ইন্ডিয়া যাই নি। এখানে থেকে এখানেই আবার আমি প্রদীপ হতে চাই। দিদি, আপনি বুঝতে পারেন আমার দুঃখ? মা-বাবা-বোন, আমার নাম, আমার পরিচয় একটা মাত্র রাতে আমার সব কিছু হারিয়ে যাবার দুঃখ? দিদি, আমাদের ধর্মে বলে, ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে। কই, আমার ধর্ম তো আমাকে রক্ষা করতে পারল না?

কথাগুলো বিলকিস ভালো করে শুনতে পায় না। তার মনের ভেতরে বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত ছেলেটির টুকরো টুকরো কথা, আচরণ, প্রতিক্রিয়া, সম্বোধন দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে।

প্রদীপ।

দিদি।

কে বলে তুমি ভীতু? তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়।

১০. পাটের গুদামে

রাত কেটে যায়। বাইরে ভোর হয়ে গেলেও ভেতরে অন্ধকার কাটে না। তারপর সূর্য যখন প্রবল হয় তখন ভেতরটা একটু ফিকে হয়ে আসে। সেই অস্বাভাবিক গোধূলিতে দেখা যায় স্তুপাকার পাটের ভেতরে সরু পথের দুই প্রান্তে আছে দুজন। মৃত্যুর যে কনিষ্ঠ ঘুম, মৃত্যুর মতোই আমোঘ ও অনিবার্য। এই দুটি মানুষের গতকালের শ্রম, শোক, আকস্মিকতা এখন নিপুণ হাতে নিরাময় করে চলছে ঘুম। বাইরে, পাটের স্তুপের পেছনে টিনের একটা দেয়ালের ওপারেই লাশের সংখ্যা কম দেখে বিহারীদের বিস্ময়, কোলাহল, দৌড়, সৈন্যদের খবর পেয়ে আসা, শেয়ালে খুড়ে ফেলা খালপাড়ের ঐ কবর আবিষ্কার, আকাশে সৈন্যদের গুলি ছোড়া, কিছুই ঘুমের চিকিৎসাধীন মানুষ দুটির শ্রবণে পশে না। বিহারীরা বাঙালিদের একটা পাড়া দৃষ্টান্ত হিসাবে পুড়িয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্থায়ীন ছাউনির অধিনায়ক মেজর সংক্ষিপ্ত না বলে তাদের নিরস্ত করে। মেজর তাদের জানায় না যে, গত রাতে রংপুর জলেশ্বরী একমাত্র সড়কটির ওপর পাতা মাইনে সেনাবাহিনীর একটা জিপ উড়ে যায়, তিনজন নিহত হয়। বিহারীরা জলেশ্বরীতে কোনো বাঙালির সন্ধান না পেয়ে আলেফ মোক্তারের বাড়িতে ঢোকে এবং গলায় ফাঁস টেনে তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। তাদের অগোচরে জলেশ্বরী বাজারেই দুটি বাঙালি অকাতরে ঘুমায়। যেখানে তারা ঘুমিয়ে সেই গুদামের ঠিক বাইরে দিনের রৌদ্রোজ্জ্বল নিরাপত্তার ভেতরে বিহারী কয়েকটি যুবক বন্দুক ঘাড়ে করে টহল দেয়। তাদের কিছু আত্মীয়, কিছু বন্ধু, বিক্ষিপ্ত লাশগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসে থাকে, সিগারেট ফোকে। কারো কারো গলায় জরির সরু মালা। সৈন্যরা জলেশ্বরীতে প্রথম আসবার পর থেকে এই শখটি বিহারীদের কারো কারো ভেতরে দেখা যায়।

১১. বন্দুক

অন্ন কিংবা জল কিছুই নয়, এখন তারা অপেক্ষা করে থাকে মধ্যরাতের জন্য। বিলকিস বলেছিল, পাটের গুদামের ভেতরে কথা বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না, তবু জেগে ওঠার পর, নিজেদের এই মসৃণ খসখসে আঁশের স্তুপের ভেতরে আবিষ্কার করবার পর বাইরে পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর শোনবার পর, একটি কথাও নিজেদের ভেতরে তারা বলে নি। গত রাতের মাটি, কাদা, স্বেদে বীভৎস মূর্তি দুটি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকে সারা দিন।

সন্ধে হয়ে যায়। মনে হয়, বাইরে উপস্থিত লোকের সংখ্যা একে একে কমে যাচ্ছে। তারপর, এক সময় বাইরেও অখণ্ড এক স্তব্ধতা ঝপ করে ঝুলে পড়ে।

এতক্ষণ দুজন দূরত্ব রেখে বসে ছিল, স্তব্ধতার নিঃশব্দ ঘণ্টাধ্বনির পর একই সঙ্গে তারা পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে, তাদের নিঃশ্বাসের গতি দ্রুততর হয়, হাতে হাত রাখে এবং উৎকর্ণ হয়ে তীব্র অপেক্ষা করে।

কথা বলে বিলকিস প্রথম। অনেকক্ষণ নীরব থাকবার জন্যে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং প্রেতলোকের মতো শোনায়। কানের কাছে মুখ রেখে সে বলে, আজ রাতেই শেষ করে ফেলতে হবে।

বাইরে, কবরটা ওরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। কিনা, লাশের সংখ্যা কম দেখে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সিরাজকে জাগ্রত প্রতিটি মুহূর্তে শঙ্কিত এবং ভাবিত করে রেখেছিল। সন্ধের আগেই গুদামের ভেতর নিকষ অন্ধকার দেহ বিস্তার করে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে সে আবিষ্কার করে, তার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। সেই আবিষ্কার মুহূর্তের ভেতরে তাঁর আত্মায় ফিরিয়ে আনে মৃত্যুর সান্নিধ্য, চিতার আগুন, কবরের মাটি এবং যোজন ব্যাপী নিঃশব্দ প্রবল ঘণ্টাধ্বনি।

সময় বয়ে যায়। পনেরো মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা, অথবা একটি জীবনকাল, বোধিতে ধরা পড়ে না।

বিলকিস সিরাজের পাশ থেকে উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে কানে কানে বলে, ওদিকে টিনের একটা ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কেউ নেই। ভালো করে দেখেছি। এই সময়।

দরোজার কাছ থেকে পাটের বেল দুটো আবার সেই পরিশ্রম করে সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোয় তারা। বেরিয়ে দরোজার পাশেই অন্ধকারে চুপ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। বাইরে খোলা হাওয়া জলের মতো তাদের ধৌত করে যায়। শরীরের সমস্ত ক্লোদ, ক্লান্তি, কাদার অনুভব নিঃশব্দে মুছে যায়। আবার পূত পবিত্র বলে বোধ হয় নিজেদের। একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে তারা এগোয়। গুদামের সমকোণ ঘুরে, সরু গলি পথ অতিক্রম করে, ঠিক বাজারের চত্বরের মুখে স্থির হয় তারা। বিলকিসই প্রথম মাথা বাড়িয়ে দেখে নেয় চত্বরটা।

অবিকল গত রাতের মতো। লাশগুলো তেমনি পড়ে আছে। অন্ধকার তেমনি খণ্ডিত হয়ে ইতস্তত লম্বমান, যেন সেগুলোও একেকটি লাশ। বস্তুত, কোনটা লাশ, কোনটা অন্ধকার ভালো করে বোঝা যায় না। পেট উঁচু সেই আধখানা চাঁদও আবার ফিরে আসছে, বাজারের পেছনে গাছপালার ঝাঁকড়া মাথার ভেতর থেকে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

সিরাজকে ইশারা করে কাছে আসতে। সিরাজও আবার সেই দৃশ্য দ্যাখে।

চিবুকের সংক্ষিপ্ত একটা দোলন তুলে নীরবে বিলকিস তার পরামর্শ জানতে চায়। এগুবো? নিঃশব্দে সিরাজ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

বসে বসেই এগিয়ে যায়। তারা। গলি ছেড়ে দোকানের বারান্দায় পড়ে। এমনও একবার মনে হয়, তারা নয় বরং দৃশ্যটাই সচল হয়ে তাদের সমুখ দিয়ে সরে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ফিরে আসে আস্থা, অভ্যাস এবং লক্ষ্য। তারা পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়।

এবার আরো অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আরো লাশ চোখে পড়ে। আজ মৃতের অনৈসর্গিক ঘ্রাণ টের পায় তারা। ঠিক গলিত শবের নয়, লোবানেরও নয়। বিয়োগের বিষণ্ণতার ঘ্রাণ।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কান খাড়া করে রাখে তারা। দূরে কাছে কোনো শব্দ ওঠে না। পৃথিবীকে জীবিতের বসতি বলে মনে হয় না। সেই শেয়াল কিংবা অন্য কোনো শেয়াল দ্রুত দৌড়ে চলে যায়। তার পেছনে আজ আরো একটিকে দেখা যায়। তারা খালপাড়ের দিকে গলি পথ দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

ফিসফিস করে বিলকিস বলে, ধারে কাছে কেউ থাকলে ওরা আসত না।

সিরাজের কাছে আজ। এটি নির্ভরযোগ্য সংকেত বলে বোধ হয়।

দোকানের বারান্দা ছেড়ে আরো খানিক এগিয়ে যায় তারা। কেন যায়, কীসের টানে যায়, তারা জানে না। সিরাজের এমন বোধ হয়, বিলকিস খোকাকে সন্ধান করতে এগোয়।

বিলকিস বলে, কাল ওদিকে দেখা হয় নি।

মাছের আঁশটে গন্ধ পেরিয়ে বাঁক নিতেই আবার একটা এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে দুটি লাশ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে বেশ কিছুটা ব্যবধান। তাদের একজন হয়তো খোকা। না বিলকিস, না সিরাজ, কেউই প্রথম উদ্যোগ নেয় না। হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা আশা করে অপরজন এগোবে।

শেষ পর্যন্ত দুজনই ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুজনেই আবার বিস্তৃত চত্বরের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষ ও অন্ধকারে লাশ দেখে কিংবা দেখে না। এখন সমস্ত কিছুই

বাস্তবের অনিবার্য অংশ বলে দর্শকের ঔদাস্য জন্ম নেয়। মৃতেরাও একই ঔদাস্যের সঙ্গে জীবিতের উপস্থিতি সহ্য করে।

আবার তারা ফিরে আসে চত্বরের মাঝামাঝি পূর্ব দিকে ঘেঁষে দোকান ঘরগুলোর ছায়ার ভেতর দিয়ে। স্থির হয় আবার। মানুষ যে স্বাভাবিকতা নিয়ে তার নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে, অস্বাভাবিক এই সংস্থাপনে সেই স্বাভাবিকতাই একমাত্র হয়।

সিরাজ।

দিদি।

তার দিদি সম্বোধনে এই একটা ফল হয় যে, বিলকিস বাস্তবের নির্মমতার ভেতরে ফিরে আসে।

বিলকিস সংশোধন করে আবার ডাকে, প্রদীপ!

একই সঙ্গে সেও সংশোধনে সাড়া দেয়–আপা। এবং একই সঙ্গে দুজনের দিকে স্মিত চোখে তাকায়। নির্মল সেই মুহূর্তটি ক্ষণজীবী হয়।

পলকের ভেতরে বিষণ্ণ গলায় বিলকিস বলে, তোমাকে সিরাজ বলেই ডাকব।

বিলকিস সেই দিনটির জন্যে ক্ষণকাল প্রার্থনা করে যখন তাকে প্রদীপ বলে সে ডাকতে পারবে।

সিরাজ, মনে হয় খোকা ওদিকে আছে।

আমারও মনে হলো।

নীরবতা।

ওরা কি টের পেয়েছে, সিরাজ, যে আমরা কাল কবর দিয়েছি?

সিরাজ, এখানে শেষ হয়ে গেলে আমাকে নবগ্রামে নিয়ে যাবে।

নবগ্রামে?

তোমার মনসুরদার কাছে।

নীরবতা।

সিরাজ, আমি কাজ করব।

নীরবতা।

নদীর ওপারে যাবেন না?

বিলকিস প্রসঙ্গটা বুঝতে পারে না।

নদীর ওপারে কেন?

আপনার মা, বোনকে খুঁজবেন না?

তখন মনে পড়ে যায় বিলকিসের। মনের ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখে, মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কোনো আকুতি সেখানে অবশিষ্ট নেই।

ওদের জন্যে আমি কাজ করতে চাই।

নীরবতা।

আজ একটি লাশও যেন পড়ে না থাকে।

নীরবতা।

চল।

সিরাজের ধারণা হয়, প্রথমে তারা নতুন আবিষ্কৃত লাশ দুটির কাছে যাবে। বিলকিস কিন্তু সেদিকে যায় না। সে এগিয়ে যায়, যেখানে বসে ছিল, তার নিকটতম লাশটির দিকে। পড়ে ছিল ফাঁকা একটা জায়গায়। লাশটির সারা শরীর অন্ধকারে ঢাকা। দূর থেকে অন্ধকার বলেই ভুল হয়। বিলকিস একা সেই লাশ টেনে সোজা করে চিৎ করে শুইয়ে দেয়।

এসো, এর পাশে আমরা সবাইকে রাখি।

মুহূর্তের ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দুজন। নিঃশব্দে একের পর এক লাশগুলো টেনে এনে তারা জড়ো করতে থাকে। সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। চাঁদ আরো সরে আসে আকাশে। আজ মেঘ নেই। চত্বরের ওপর বীভৎস শ্বেতীর মতো ছেড়া আলো পড়ে থাকে।

যখন সমস্ত চত্বর খালি হয়ে যায়, অবসন্ন চোখে একবার তাকিয়ে দ্যাখে দুজন সারি সারি মানুষগুলোর দিকে। গণনার যে স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের, তা তারা দুজনেই বিস্মৃত হয়। তারপর এগোয় সেই শেষ প্রান্তের দিকে, যেখানে আরো দুটি লাশ। তারা আজ আবিষ্কার করেছে।

কতদিন খোকাকে দেখে নি বিলকিস। হার্মোনিয়াম কেনার টাকা চেয়ে পায় নি বলে রাগ করে যে চিঠি দিয়েছিল সেই শেষ চিঠি।

বুকে পড়ে স্থির তাকিয়ে থাকে বিলকিস।

বুকের ওপর নীল জামোটা কুঁচকে আছে। ধীর হাতে মসৃণ করে দেয় সে।

খোকাকে দ্যাখ, সিরাজ।

সিরাজ তার পাশে বসে পড়ে। দুহাত মাটিতে রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে।

খুব ভালো গান গাইত?

হাঁ।

নীরবতা।

আমার কাছে হার্মোনিয়াম চেয়েছিল।

নীরবতা।

মাকে খুব ভালোবাসত। মার কাছে থাকবে বলে ঢাকায় আমার কাছে আসে নি।

বিলকিস মৃতদেহের বুকের ওপর হাত রেখে নিজের ভেতরের বিকট শূন্যতার সঙ্গে নীরবে লড়াই করে।

ঠিক তখন পিঠের ওপর শক্ত একটা কিছু অনুভূত হয়।

অস্ফুট ধ্বনি করে পেছন ফিরে দ্যাখে, ছায়ার মতো চারটি যুবক। তাদের হাতে বন্দুক।

১২. মেজর

ঘুম থেকে উঠে আসে স্থানীয় ছাউনির অধিনায়ক মেজর। উর্দি পরেই শুয়েছিল, কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে সমুখে এসে দাঁড়ায়। বিলকিস আর সিরাজের দিকে ঈষৎ কুঞ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকে সে।

যারা তাদের ধরে এনেছে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা উৎসুক চোখে। বার বার দৃষ্টিপাত করে মেজরের দিকে। কারো কারো মনে মেজরের সর্বশক্তিমান দেহ কাঠামো, দৃষ্টির স্থির তীক্ষ্নতা ঈর্ষার উদ্রেক করে।

মেজর চোখ ফিরিয়ে ছোঁকরাগুলোকে একবার দেখে নেয়। তারপর ক্লান্ত একটা হাত তুলে তাদের চলে যেতে ইশারা করে। তারা আশাহত হয় এবং সংক্ষিপ্তকাল ইতস্তত করে বেরিয়ে যায়।

জলেশ্বরী হাই স্কুলের এই ঘরটা ক্লাশ নাইন বি সেকশনের ঘর, এখন একেবারে অপরিচিত মনে হয় সিরাজের।

মেজর একটা চেয়ারে বসে, সমুখে দুপা ছড়িয়ে দিয়ে, যেন তার কোনো তাড়া নেই, ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে ইশারা করে।

দরোজার একজন সৈনিক বেঁটে চওড়া বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। বিলকিস এক পা এগিয়ে আসতেই মেজর তর্জনী তোলে। দাঁড়িয়ে পড়ে বিলকিস। মেজর সিরাজকে নীরবে নির্দেশ করে। সিরাজ এগিয়ে আসে এক পা। থামে। মেজর আবার তর্জনীর ইশারা করে। তখন সিরাজ আরো কাছে আসে।

দূরত্বটা মনঃপূত হলে মেজর সিরাজের চোখের দিকে স্থির কঠিন দৃষ্টিপাত করে এবং একই সঙ্গে ঠোঁটে বিপরীত মৃদু হাসি সৃষ্টি করে নিচু গলায় জিগ্যেস করে, হু ইজ শি?

সিরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

উর্দুতে আবার সেই একই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। এবার প্রশ্ন করে সে বিলকিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কান ফেলে রাখে সিরাজের উত্তর শোনার জন্যে।

বিলকিস। উত্তর দেয়, আমি ওর বোন।

আপাদমস্তক দেখে নেয় বিলকিসকে, তারপর প্রতিধ্বনি করে, বহেন?

হ্যাঁ।

হাঁ

ভাই-বোন?

হ্যাঁ।

আপন ভাই-বোন?

হ্যাঁ।

তফাত অনেক। মাঝখানে আরো ভাই-বোন আছে? তোমাদের মা-বোন নিশ্চয়ই আরো কিছু বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দিয়েছে। দেয় নি?

চুপ করে থাকে দুজনেই।

ঠিক আছে, জবাব দিতে হবে না। আমরা জানি পশুর মতো বাঙালিরা সন্তান উৎপাদন করে। বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দেয়। তবে, বিশ্বাসঘাতক হলেও কখনো কখনো তারা সুশ্রী হয়।

মেজর উঠে দাঁড়িয়ে কাছে আসে বিলকিসের। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে দুজনকে ঘিরে ধীর চক্কর দিয়ে আবার সমুখে স্থির হয়।

বাজারে গিয়েছিলে?

নীরবতা।

লাশ নিতে?

নীরবতা।

হুকুম শোন নি।

নীরবতা।

কবর দিতে চেয়েছিলে? কাল কয়েকটিকে কবর দিয়েছে কারা?

বিলকিস ও সিরাজ দুজনেই সচকিত হয়।

মেজর এবার কেবল বিলকিসকেই প্রদক্ষিণ করে সমুখে ফিরে আসে।

জানোয়ার খুঁড়ে তুলেছে।

ধীরে ধীরে বিলকিসের ভেতরটা কঠিন হয়ে আসে।

মেজর হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, জান না, কুকুরের কখনো কবর হয় না?

হাতের ছড়ি দিয়ে সিরাজের পেটে খোঁচা দিয়ে মেজর তাকে বিলকিসের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর চেয়ারে ফিরে গিয়ে দুজনকে এক সঙ্গে সে আবার দেখতে থাকে।

১৩. হিন্দু

মৃতদের আমরা সৎকার করব।

অবলম্বনহীন দ্বিতলের মতো, অসংলগ্ন মেঘ ও চিত্রকণার মতো, অসম আকার ও গতিবেগের মতো এই বর্তমান অন্তঃস্থলে স্থির কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে স্থাপিত। মানুষ তার নিগঢ় শক্তির সংবাদ রাখে না। যে সারল্য সে লালন করে তা কাচের মতো ভংগুর এবং একমাত্র হীরক, কঠিনতম পদার্থই তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে। তখন সারল্যের অংশগুলো বিস্মৃতির ভেতরে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

প্রযুক্তি ব্যতীত জীবন নয়।

বস্তুতপক্ষে আঘাত বিনা প্রতিরোধ একটি অসম্ভব প্রস্তাব। বীভৎস বাস্তবের বিপরীতে গীতময় স্বপ্ন অথবা বধির দুঃস্বপ্নের বিপরীতে রৌদ্র ঝলসিত বাস্তব; মানুষকে এই বিপরীত ধারণ করতেই হয় এবং তার ভূমিকা, অন্তত এতে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়, এক ব্যায়াম প্রদর্শকের, যে আয়নায় আপনারই প্রতিবিম্বের সমুখে একটি ইস্পাত খণ্ডকে বাকিয়ে তার দুই বিপরীত প্রান্ত নিকটতর করে আনবার পর অবসর কিংবা করতালি পায় না, অচিরে দ্বিতীয় ইস্পাত খণ্ড তার হাতে পৌঁছে যায়।

নিশ্চয় আমি মাটি থেকে মানুষকে উৎপন্ন করেছি। মাটি ভিন্ন মানুষের মৌলিক কোনো অভিজ্ঞতা নয়। এবং প্রত্যাবর্তনের সুদূরতম সম্ভাবনা নেই জেনেও মানুষ মাটির সঙ্গেই

তার শ্রেষ্ঠতম সংলাপগুলো উচ্চারণ করে যায়। বস্তুত উচ্চারণও মাটির তীব্র আকর্ষণ থেকেই কাতর কিংবা সুখের, যোগ অথবা বিয়োগ ধ্বনির–নামান্তর। জননীর কাছে পুত্রশোকও কালক্রমে সহনীয় হয়ে যায়, ইউলেসিস অমরত্ব লাভের প্রস্তাব হেলায় উপেক্ষা করে ফিরে আসে অনুর্বর ইথাকার।

মৃতদেহ আমরা সেই মাটিতে ফিরিয়ে দেব, নতজানু হয়ে মুঠো মুঠো মাটিতে ঢেকে দেব তাদের দেহ, আমরা কেশ মার্জনা করব না, আমরা মুখ সংস্কার করব না, জীবিত এই দেহে মাটির প্রলেপ ধারণ করে আমরা বিপন্ন বাস্তবের ভেতর দিয়ে জনপদের দিকে ফিরে যাব।

স্মৃতির চেয়ে সম্পদ আর কী আছে? জনপদে এখন কণ্টিকারী ও গুল্মলতার বিস্তার, শস্য অকালমৃত, ফল কীটদষ্ট, ইদারা জলশূন্য। সড়কগুলো শ্বাপদেরা ব্যবহার করে এবং মানুষ অরণ্যে লুকোয়। দিন এখন ভীত করে, রাত আশ্বস্ত করে। বাতাস এখনো গন্ধবাহ, তবে কুসুমের নয়, মৃত মাংসের। তবু, স্মৃতি বিনষ্ট অথবা নিঃশেষে ধৌত নয়। রমণীর গর্ভ বন্ধ্যা নয়। পুরুষের বীর্য ব্যর্থ নয়। গ্রন্থগুলো দগ্ধ নয়। প্রতিভা অন্তর্হিত নয়। মানুষ সেই লুণ্ঠিত জনপদেই স্মৃতি বীজের বাগান আবার করে।

বিলকিসও নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে।

বিলকিস ও সিরাজ দুটি আলাদা ঘরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

একাকী ঘরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে থাকে। তোমার নাম?

সিরাজ।

বাড়ি?

জলেশ্বরী।

তোমার বোনের নাম?

বিলকিস।

ধর্ম?

ঠিক আগেই বিলকিসের উল্লেখ ছিল, তাই মিথ্যা না বলেও নিরাপদ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মুসলমান।

ইন্ডিয়া কবে গিয়েছিলে?

ইন্ডিয়া যাই নি।

ইন্ডিয়া থেকে কবে এসেছ।

আমি এখানেই ছিলাম।

ইন্ডিয়া থেকে কজন এসেছে?

জানি না।

ইন্ডিয়া থেকে কারা এসেছে?

জানি না।

তাদের নাম কী?

জানি না।

কোথায় আছে?

জানি না।

খালের পুলে ডিনামাইট কে পেতেছে?

www.bengaliebook.com

জানি না।

সড়কে মাইন কে পেতেছে?

জানি না।

কী জান?

নীরবতা।

কলমা জান?

নীরবতা।

নামাজ জান।

নীরবতা।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে মেজর চিৎকার করে ওঠে, বোনের সঙ্গে শুতে জান?

স্তম্ভিত হয়ে যায় সিরাজ।

তার গালে চড় মেরে এক ধরনের উপশম হয় মেজরের। বিলকিসের শরীর এবং সম্ভাবনা তাকে অনবরত তাড়না করে চলেছিল। সৈনিককে সে নির্দেশ দেয় প্রহার চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে বিলকিসকে যে ঘরে রাখা হয়েছে, সেখানে ঢোকে।

সেখান থেকে সিরাজের তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। মেজর ঘরে ঢুকতেই বিলকিস তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। না, তোমাকে প্রহার করব না। স্বীকারোক্তির জন্যে তোমাকে বাধ্য করব না। মেজর কাছে এগিয়ে আসে।

স্বীকারোক্তি তোমার ভাই করবে।

নীরবতা।

কোনো কিছুর জন্যেই তোমাকে বাধ্য করব না, এমনকি তোমার দেহের জন্যেও নয়।

বিলকিস মেজরের দিকে ঘুরে তাকায়।

মেজর নিঃশব্দে হাসে।

তুমি নিজেই আমার কাছে আসবে।

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয় বিলকিস।

দূরে সিরাজের আর্তনাদ এখন গোঙানিতে পরিণত হয়। তারপর হঠাৎ তা স্বব্ধ হয়ে যায়। দিনের সূর্য অস্ত যায়। রাতের চাঁদ উঠে আসে। ইস্কুলের মাঠে ফুটবলের গোলপোস্টকে আতিবিস্তৃত ফাঁসি কাষ্ঠের মতো দেখায়। টিনের ছাদের নিচে চামচিকে ঝুলে থাকে। দূরে কোথায় তক্ষক ডেকে ওঠে। বহুক্ষণ অনুপস্থিতির পর মেজর আবার আসে।

হাঁ, তুমি নিজেই আমার কাছে আসবে।

নীরবতা।

আমি বাধ্য করব না। কাউকে আমি বাধা করি না।

মেজর মনে করতে চায় না। কিন্তু মনে না করে পারে না তার নিজের একটি শারীরিক অক্ষমতার কথা। বড় দ্রুত ব্যয়িত হয়ে যায় সে। সেই অভাবটুকু তাকে পূরণ করতে হয় আত্মস্তিরতা দিয়ে। রমণীর প্রতি একই সঙ্গে প্রবল আকর্ষণ ও গভীর বিরক্তি সে বোধ করে থাকে।

আসলে আমি অত্যন্ত সহৃদয়।

নীরবতা।

সহৃদয়তার পরিচয় তুমি পেয়েছ আমার সহিষ্ণুতায়। নিশ্চয়ই শুনেছি, আমার বন্ধুদের অনেকে রমণীদের বাধ্য করেছে। আমি করি নি।

নীরবতা।

তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

নীরবতা।

পানি দেওয়া হয়েছে, গোসল কর নি কেন?

নীরবতা।

খাবার দেওয়া হয়েছে, খাও নি কেন?

নীরবতা।

লেখাপড়া কতদূর করেছ? দেখে শিক্ষিত মনে হয়।

নীরবতা।

ইংরেজি বলতে পোর?

নীরবতা।

যে মেয়ে ইংরেজি বলতে পারে, আমি তাকে পছন্দ করি।

নীরবতা।

তারা বোঝে। মনের প্রয়োজন বোঝে। শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন বোঝে।

নীরবতা।

তুমি বিবাহিতা? অবশ্যই তুমি বিবাহিতা। তোমাকে দেখায় বিবাহিতা। তোমার স্বামী, কী বলে, তোমার সঙ্গে, কী বলে, একইভাবে প্রতি রাতে মিলিত হয়?

নীরবতা।

তোমার স্বামী কোথায়? ইন্ডিয়ায়? জান, হঠাৎ হাসি পেল কেন? আমাদের হাতে কেউ মৃত্যুদণ্ড পেলে আর তার আত্মীয়স্বজন খোঁজ নিতে এলে আমরা বলি–ইন্ডিয়ায় চলে গেছে।

নীরবতা।

একইভাবে না বিভিন্নভাবে?

নীরবতা।

মেজর ফ্লাক্স খুলে হুইস্কি ঢেলে নেয়। নিঃশব্দে পান করে অনেকক্ষণ ধরে। বিলকিসের থেকে চোখ এক মুহূর্তের জন্যে ফিরিয়ে নেয় না। বাইরে টহলদার সৈনিকদের পদচারণা শোনা যায়।

আচ্ছা, অন্তত একটা কথার উত্তর দাও। আমি তোমাকে আকৃষ্ট করি?

নীরবতা।

আমি অপেক্ষা করতে পারি। আজ রাতে আমার ডিউটি নেই। উত্তর পেলে কালও আমি ছুটি নিতে পারি। উর্দু না জানলে ইংরেজিতে উত্তর দাও। যারা ইংরেজি বলে আমি পছন্দ করি। তুমি আমাকে পছন্দ কর?

চেয়ার টেনে কাছে সরে আসে মেজর।

ভরসা দিতে পারি, তুমি আমাকে পছন্দ করবে।

মেজর আরো খানিকটা সুরা ঢেলে নেয়।

কেন করবে না? আমার বীজ ভালো। আমার রক্ত শুদ্ধ। রমণী স্বয়ং উদ্যোগী হলে অবশ্যই আমাতে তৃপ্ত হতে পারবে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি? আমি তোমোয় সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানি হবে, চাও না সেই সন্তান? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, শ্লোগান দেয় না, কমিউনিস্ট হয় না। জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি। তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানি রেখে যাব, ইসলামের নিশান উড়িয়ে যাব। তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে, তোমরা আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমরা আমাদের সুললিত গান শোনাবে। আমি শুনেছি, বাঙালিদের গানের গলা আছে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি?

ঢক ঢক করে অনেকটা সুরা এবার গলায় ঢেলে নেয়। মেজর। এতক্ষণের বিরতি পুষিয়ে নেয় একবারে। স্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে বিলকিসের দিকে। সেখান থেকে সাড়া আসে না। বিলকিস স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

দেয়ালের গায়ে অকস্মাৎ গেলাস ছুঁড়ে দিয়ে মেজর চিৎকার করে বলে, আমি বলেছি, বাধ্য তোমাকে করব না। আমি এখন কুকুরের সঙ্গে কুকুরের মিলন দেখব।

শরীরের ভেতরে মেজর প্রবল আকর্ষণ বোধ করে নিজের হাতে বিলকিসকে বিবসনা করবার জন্যে। এক পা কাছেও আসে। কিন্তু অন্তঃস্থল থেকে দুর্বল বোধ করে সে। গুলি করতে ইচ্ছে হয়, করে না, তার বদলে আর্দলীকে ডাকে। নির্দেশটা তাকেই দেয়।

আর্দালি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে রূঢ় গলায় বিলকিসকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বিলকিস যেন শুনতে পায় নি। তখন তার বাহু ধরে হ্যাচক টান দেয় আর্দালি।

মেজর ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলে, আহ, ধৈর্যের সঙ্গে কাজ কর।

আর্দালির বলবান দেহটিকে সে ঈর্ষা করে আর সেটা চাপা দেবার জন্যে আরো খানিকটা পান করে।

হাজার হাজার বছর কাপড় পরে মানুষের রক্তের ভেতর আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা ঢুকে গেছে। পোশাক তার দ্বিতীয় ত্বক। সেই ত্বকে টান পড়তেই বিলকিসের প্রতিক্রিয়া হয়

বাধা দেবার। সে দেয়, কিন্তু সফল হয় না। আর্দালি অবিলম্বে তার শাড়ি হরণ করে নেয়।

আহ, ধৈর্য, ধৈর্য।

চেয়ারে বসে মেজর ক্রমাগত মাথা এপাশি-ওপাশ করতে থাকে।

আর্দালির হাতে বিলকিসের দেহ-স্পর্শ কল্পনা করে সে নিজের হাতের তালু অনবরত কচলাতে থাকে।

জুম্মা খাঁ, ধৈর্য।

বিবসনা হয়ে যায় বিলকিস। দৃষ্টিপাত করেই চোখ ফিরিয়ে নেয় মেজর। চোখের পাতা অন্তিম পর্যন্ত বুজে, হাত কচলে নগ্ন রমণীর স্মৃতি যেন সে পিষ্ট করে ফেলতে চায়। মুখ সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ফিরিয়ে রেখেই আর্দালিকে সে কাছে ডেকে অস্ফুট স্বরে আদেশ করে সিরাজকে নিয়ে আসতে।

আর্দালি বেরিয়ে যেতেই মেজর ধীরে ধীরে মুখ ফেরায়, চোখ ফেরায়, প্রথমে মিটমিট করে, তারপর পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে দ্যাখে। উঠে দাঁড়িয়ে বেশ দূরত্ব সত্ত্বেও কণ্ঠ না তুলে, ফিস ফিস করে বলে, সুন্দর দেহ!

খাটো বন্দুকধারী এক সৈনিক সিরাজকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে।

সিরাজ তার প্রহরাধীন বলে সৈনিক চলে যায় না। নগ্ন রমণী দেখে তার মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সে দরোজার কাছে সটান দাঁড়িয়ে থাকে দরোজার পাল্লার দিকে তাকিয়ে।

ঘরে ঢুকেই বিলকিসকে দেখে চোখ বুজে ফেলে সিরাজ। অবসন্ন দেহে চোখ বুজেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। বিলকিস চোখে বোজে না। তার চোখ উন্মুক্ত এবং স্থির।

সিরাজের চারপাশে একবার ঘুরে আসে মেজর। তারপর আর্দালিকে নির্দেশ দেয় এবার উচ্চ কণ্ঠে, একেও ন্যাংটো কর।

চমকে উঠে সিরাজ চোখ খোলে। চোখ খুলতেই বিলকিসকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে সে দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের কোমরের নিচে চেপে ধরে।

আর্দালি তার শার্ট খোলার চেষ্টা করেও যখন পরাস্ত হয়, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে শার্ট। সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে সিরাজ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত কোলের ওপর চেপে ধরে মাথা নিচু করে গুটিয়ে রাখে নিজেকে। তার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

তখন মেজর লাথি মেরে কাৎ করে দেয় তাকে। আর্দালি ঝাঁপিয়ে তার বুকের ওপর উল্টোমুখে বসে ট্রাউজারের বোতাম বদ্ধমুষ্ঠির ভেতর থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে।

সিরাজ চিৎকার করে ওঠে, না।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে বিলকিস দাঁড়িয়ে থাকে। শরীর চৈতন্য থেকে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তার শরীরও থরথর করে কাঁপতে থাকে।

নাআআ।

মেজর পা দিয়ে সিরাজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলে, বাঙালিরা কুকুরের অধিক নয় কুকুরের ভাইবোন নেই।

সিরাজের হাত দুটো ছাড়িয়ে আর্দালি নিজের ভাঁজ করা দুই হাঁটুর তলায় চেপে ধরে রাখে। তারপর বোতামে হাত দেয়।

না না না।

পটপট করে বোতামগুলো খুলে ফেলে আর্দালি।

বিলকিস চোখ বন্ধ করে। একটু আগে সে থরথর করে কাপছিল, এখন স্থির হয়ে যায়।

আর্দালি প্রথম অনুধাবন করতে পারে না। মুহূর্তের জন্যে সে বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে, স্যার, ইয়ে তো হিন্দু হ্যায়?

১৪. শাড়ি

শাড়িটা পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয় বিলকিস। শাড়ি পরিবার নানা রকম কৌশল জানার সুখ্যাতি যার, সে এখন লজ্জা নিবারণ করে মাত্র।

কয়েকজন সৈনিক ও একজন ক্যাপ্টেন ছুটে এসেছিল, মেজর নিঃশব্দে তাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করে।

ক্যাপ্টেন জানতে চায়, কোনো সাহায্য করতে পারি, স্যার?

মেজর মাথা নাড়ে।

ক্যাপ্টেন ও সৈনিকেরা চলে যায়। কেবল দরোজার প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে। তারই প্রহরাধীন ছিল। মেজর নিঃশব্দে তাকে ইশারা করে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সৈনিকটি উবু হয়ে হাত ধরে টেনে নেবার উদ্যোগ করতেই এই প্রথম বিলকিস কথা বলে ওঠে। সংক্ষিপ্ত প্রবল একটি শব্দ।

না।

তার কণ্ঠস্বরে আকস্মিকতায় বিস্ময় বোধ করে মেজর।

না।

মেজর একটু চিন্তা করে প্রহরী সৈনিকটিকে চলে যেতে ইশারা করে। অনেকক্ষণ নিষ্ক্রিয়তার পর মেজর ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে বলে, মৃতদেহ আমি পছন্দ করি না। পরাজয়ের কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

বিলকিস অতি ধীর পায়ে প্রদীপের লাশের পাশে এসে দাঁড়ায়।

একই ধীর গতিতে সে হাঁটু গেড়ে বসে। অনেকক্ষণ ধরে প্রদীপের টক-টকে লাল রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। পেট্রোম্যাকসের আলোয় অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল দেখায়, এমনকি কৃত্রিম মনে হয় এই রক্ত। গেলাসটা খুঁজে না পেয়ে মেজরের স্মরণ হয় নিজেই সে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তখন সরাসরি ফ্ল্যাক্স থেকেই গলায় খানিকটা ঢালে সে। গেলাস অথবা প্রদীপের জন্য খানিকটা খেদ তার কণ্ঠস্বরে লক্ষ করা যায়।

ওকে এখন তোমরা কী করবে? প্রদীপের দিকে চোখ রেখেই বিলকিস উচ্চারণ করে।

মেজর সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

বন্দুক কেড়ে নিতে গেল কেন? প্রাণটা হারাল।

নীরবতা।

মেজর বলে চলে, প্রাণ অবশ্য হারাত। স্বীকারোক্তি পাবার পর ইন্ডিয়ায় পাঠানো হতো। রসিকতাটি মনে করে মেজর মৃদু হেসে ওঠে।

তোমারা কি ওকে ফেলে রাখবো?

মেজর নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসে।

যেমন বাজারে ফেলে রেখেছ?

মেজর ফ্ল্যাক্স থেকে শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত গলায় ঢেলে পা সমুখে লম্বা করে দেয়।

আমার দিকে ফিরে তাকাও।

বিলকিস নত হয়ে প্রদীপের চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়।

জান? আমি কখনো হিন্দু মেয়েকে ন্যাংটো দেখি নি।

অন্তত সে বিশ্বাস করেছে। এরা ভাইবোন। তাই বিলকিসকেও হিন্দু ধরে নিয়েছে।

চোখ বুজিয়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নেয় না বিলকিস। প্রদীপের গালের ওপর তার দুটি হাত স্থির হয়ে থাকে।

আমাকে একটা কথা বল, হিন্দু কি প্রতিদিন গোসল করে?

নীরবতা।

হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ?

নীরবতা।

তাদের জায়গাটা পরিষ্কার?

নীরবতা।

শুনেছি, মাদী কুকুরের মতো। সত্যি?

নীরবতা।

শুনেছি, হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেওয়া যায় না?

নীরবতা।

আমাকে কতক্ষণ ওভাবে ধরে রাখতে পারবে?

বিলকিস প্রদীপের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেজরের দিকে তাকায়–আমি এর সৎকার করতে চাই।

তোমাকে এখন বাধ্য করতে ইচ্ছে করছে।

আমার ভাইয়ের সৎকার আমি করব।

বিলকিস উঠে এসে মেজরের সমুখে দাঁড়ায়। দ্রুত নিজের পা টেনে নেয় মেজর। কাপড় খুলে ফ্যালে।
চোয়াল চিবিয়ে মেজর উচ্চারণ করে। তার চোখ বিস্ফারিত হতে থাকে। কপালের পাশে শিরা দীপ দপ করে।
বিলকিস স্থির কণ্ঠে বলে, আগে আমার ভাইয়ের সৎকার করব।

ধীরে চোয়াল শিথিল হয়ে আসে মেজরের, মিলিয়ে যায় কপালের শিরা, চোখ স্মিত হয়। উঠে দাঁড়িয়ে মেজর বিলকিসের কাঁধে হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় বিলকিস।

ঠিক আছে। সৎকার হবে। আমি বলি নি, অত্যন্ত সহিষ্ণু আমি?

১৫. সৎকার

মাটি খুঁড়তে কতক্ষণ আর লাগে? ইস্কুলের পাশেই?

না।

তাহলে আবার কোথায়?

কবর নয়।

হঠাৎ খেয়াল হয়। শিস দিয়ে ওঠে মেজর।

ভুলেই গিয়েছিলাম, হিন্দু। হিন্দুরা কবর দেয় না। পোড়ায়। পোড়ায় কেন?

নীরবতা।

খোদা মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন। আর শয়তানকে আগুন থেকে। সেইজন্যই হিন্দুরা আগুনে ফিরে যায়।

নীরবতা।

আগুন।

মেজর মৃদু স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নেয়।

দুটিন পেট্রল হলেই চলবে তো?

না।

একটা মানুষ পোড়াতে দুটিনের বেশি লাগে না। যথেষ্ট।

কাঠ চাই।

কাঠ?

সম্ভব হলে চন্দন কাঠ চাইতাম।

মেজর আবার শিস দেয়।

স্যান্ডল উড?

কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় সে। অদ্ভুত মনে হয়। কৌতুক অনুভব করে।

আর বিলকিস ফিরে পায় তার সেই অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতা, গত রাতের মতো স্থির প্রেরণা।

কাঠ চাই।

এত রাতে কাঠ কোথায় পাবে?

আমি জানি না।

আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করছ না তো?

নীরবতা।

মৃত্যু তোৰ হোক। বিপ্লবীদের খবর দেব দিয়ে আসতে। আমি অপেক্ষা করতে তৈরি। তুমি?

অপেক্ষা কাঠের জন্যে নয়, বিলকিসের জন্যে অপেক্ষা করতে সে প্রস্তুত, এটা স্পষ্ট হয় মেজরের নিঃশব্দ হাসিতে বিদীর্ণ মুখ দেখে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বিলকিস যে উত্তর দেয় মেজরের তা বোধগম্য হয় না, তাই বিচলিত বোধ করে না।

আমিও তৈরি।

প্রদীপের গালে একটু আগে, দুহাত স্থাপন করবার মুহূর্তেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল। বিলকিস। তাই তার কণ্ঠস্বর এখন উদাস, বর্তমান থেকে বিযুক্ত এবং উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত।

কাঠ এখানে নয়।

তাহলে কোথায়?

নদীর তীরে।

নদীর তীরে কেন?

মেজর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে বিলকিসকে বিদ্ধ করে। মুহূর্তের জন্যে সুরা ও নারীর নেশা

অন্তর্হিত হয়ে যায়। হিন্দু মেয়েটার কোনো মতলব নেই তো? নদীর ওপারে ইন্ডিয়া খুব বেশি দূরে নয়। মাত্র তিরিশ মাইল, পাখির উড্ডয়নে।

হিন্দুদের সৎকার নদীর তীরে হয়।

অদ্ভুত!

আবার কাঁধ বাকুনি দেয় মেজর।

আচ্ছা, বিহারীদের জিগ্যেস করব। যদি তারা বলে হিন্দুদের দাহ নদীর তীরে হয় তো নদীর তীরেই হবে। আরেকটা কথা বল—। তোমাদের কোন দেবীর নাকি পাঁচ স্বামী ছিল?

ছিল!

মেজর লম্বা করে শিস দেয়।

ভোর হয়ে যায়।

প্রদীপের লাশের পাশে খোদিত মূর্তির মতো বসে থাকে বিলকিস। অনেকক্ষণ। তারপর শাড়ি দিয়ে প্রদীপের দেহ থেকে রক্ত মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সে। কিছু ওঠে, কিছু ওঠে না। মানচিত্রে দ্বীপের মতো রক্তের চিহ্ন প্রদীপের শরীরে অংকিত হয়ে থাকে।

দুপুরের দিকে মেজর ফিরে আসে।

চল।

জনা চারেক বিহারী ছোঁকরাকে দেখা যায়। সম্ভবত এরাই বাজারে দেখা দিয়েছিল। এখন তারা প্রদীপের লাশ নিয়ে বাইরে পিকআপ ভ্যানে তোলে। বিলকিসকে উঠতে ইশারা করে মেজর। তারপর দুজন সৈনিকের সঙ্গে সে সমুখে গিয়ে বসে। আরো দুজন সৈনিক লাফিয়ে ওঠে পেছনে।

ইস্কুলের মাঠ ছেড়ে জলেশ্বরীর জনশূল্য সড়ক দিয়ে চোখ ঝলসানো রোদ্দুরের ভেতরে ভ্যান আধকোশা নদীর দিকে ছুটে যায়। মোটরের গর্জন স্তব্ধতাকে আরো বিকট করে তোলে।

আধিকোশার নিকটতম তীরে এসে দেখা যায় সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে আরো কয়েকজন বিহারী ছোকরা। তারা একস্তুপ কাঠের অদূরে বন্দুক হাতে নিয়ে লম্বা পায়ে টহল দিচ্ছে। নদীর তীরও একই প্রকার জনশূন্য। জল বয় না। পাখি ওড়ে না। নদী শুকিয়ে পাড়ে যে বিস্তৃত বালির বিছানা হয়ে আছে, রোদুরে উত্তপ্ত হয়ে আছে, খালি পায়েও বিলকিস তা অনুভব করতে পারে না।

ভ্যান থেমে যাবার পর মেজর নেমে এসে ভ্যানেরই পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিয়ে সে পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়ায়।

অতঃপর কী কর্তব্য বুঝতে না পেরে বিহারী ছোঁকরাগুলো একে অপরের কাছাকাছি গা ঘেষাঘেষি করে নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলে। বার বার জিজ্ঞাসু চোখে মেজরের দিকে তাকায়। বন্দুক হাতে সৈনিকদের দিকে সসম্ভ্রমে ঘনঘন দৃষ্টিপাত করে তারা।

বিলকিস কখনো চিন্তা রচনা দূরে থাক, দাহ-সৎকার পর্যন্ত দ্যাখে নি। মানুষের রক্তের ভেতরে মৌলিক কিছু কর্তব্য সম্পাদনের নীল-নকশা থাকে। বিলকিস নীরবে দ্রুত হাতে কাঠগুলো বিছানার মতো করে সাজায়। উনোনে কাঠ দেবার স্মরণে সে দুসারি কাঠ ঢালু। করে সাজায়, যেন আগুনের বিস্তার সহজ ও সতেজ হয়। তারপর মেজরের দিকে তাকায়। মেজরের নিঃশব্দ ইশারা পেয়ে বিহারী ছোঁকরাগুলো প্রদীপকে ভ্যান থেকে নামিয়ে আনে। চিতার দিকে এগোয় তারা। চিতার কাছে, বিলকিসের পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। অচিরে বিলকিসের নীরব অথচ স্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে লাশটিকে তারা চিতার ওপর শুইয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে সরে যায়। তারা আগের জায়গায় ফিরে না গিয়ে আরো দূরে ভ্যানের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

রোদের ভেতরে প্রদীপের মুখ ধৌত দেখায়। একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করেই বিলকিস চোখ ফিরিয়ে নেয়। আর সে তাকায় না। প্রদীপের সমস্ত দেহ ঢেকে দেয় কাঠ দিয়ে। তারপর মাথার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সে। সুদূর কোনো চিত্রের মতো বাজারে শায়িত খোকার লাশের কথা মনে পড়ে যায় তার।

মেজর ঢালু বেয়ে নেমে আসে। নদীর তীরে বিলকিসের একাকী তৎপরতা এতক্ষণ সে দেখছিল। দীর্ঘ সময় নেবে। আগুন ধরে উঠতে, সে উপলব্ধি করে একজন সৈনিককে পেট্রলের টিন নিয়ে অনুসরণ করতে বলে। সৈনিকটি চিতার চারপাশ ঘিরে পেট্রল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বিলকিস তা লক্ষ করে না। ছায়ার মতো সঞ্চারণ তার পাশে সে অনুভব করে, কিন্তু চেতনায় তা প্রবেশ করে না।

অচিরকালের ভেতরের একটি বোধ জেগে ওঠে। সমুখে শায়িত মৃতদেহটিকে সে আর বিশেষ বলে গণনা করে না। স্বয়ং মৃত্যুই তার সমুখে শায়িত মনে হয়।

বিহারী একটি ছোঁকরা মেজরের ইশারায় দেশলাই ছুঁড়ে দেয় বিলকিসের দিকে।

মৃত এবং মৃত্যু দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের আলিঙ্গনে দৃষ্টির অতীত হয়ে যায়।

অপলক চোখে সেই লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে বিলকিস।

মেজরের নির্দেশে বিহারী দুটি ছোঁকরা বিলকিসের কাছে এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হাত ধরে। বিলকিস নড়ে না। আবার তারা টান দেয়। এবার আরো জোরে।

দূরে মেজর বিড়বিড় করে, ধৈর্য ধৈর্য।

ছোঁকরা দুটো নারী দেহের কোমলতা অনুভব করছে, তার ঈর্ষা হয়। বিরক্তির উদ্রেক হয়।

সে নিজেই ঢালু বেয়ে নেমে আসে নিচে। ছোঁকরা দুটো থাতমতো খেয়ে সরে দাঁড়ায়। নারীবাহুর কোমলতা তারা ভুলতে পারে না।

মেজর এসে বিলকিসকে বলে, এরপর কী?

বিলকিস সাড়া দেয় না।

তার পেছনে নদীর জল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পোড়া মাংসের গন্ধে পেটের ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চায়, সে সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও। আগুনের প্রবল হালকা অনুভব করে। নাকমুখ ঢাকবার চেষ্টা করে মেজর প্রাণপণে। বিলকিসকে আকর্ষণ করে।

ঠিক তখন বিলকিস তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পর মুহূর্তেই বিস্ফারিত দুই চোখে সে আবিষ্কার করে, রমণী তাকে চিতার ওপর ঠেসে ধরেছে, রমণীর চুল ও পোশাকে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠ বিদীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে। রমণীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু রমণীকে আগুন দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরণ হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি। জাতিস্মর আতঙ্কে সে শেষবারের মতো শিউরে ওঠে।

মশালের মতো প্রজ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে রাখে বিলকিস।